CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 March, 2024 ■ আগরতলা ২ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ১৮ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্য বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে

২৭৮০৪.৬৭ কোটি টাকার বাজেট পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ ।। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য আজ রাজ্য বিধানসভায় ২৭ হাজার ৮০৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ব্যয় বরাদ্দের যে প্রস্তাব পেশ করেছেন তাতে মুলধনী ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ হাজার ৬৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা যা ২০২৩-২৪ বছরের রিভাইসড এস্টিমেটের চাইতে ২৪.২৬ শতাংশ বেশি। বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৪১০ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। বাজেট প্রস্তাবে মোট আয় দেখানো হয়েছে ২৭ হাজার ৩৯৩ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। বাজেটে নতুন করে কোন করারোপ করা হয়নি। বাজেটে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ ধরা হয়েছে শিক্ষা (প্রাথমিক, বিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, ককবরক এবং যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া) দপ্তরের জন্য। এই দপ্তরের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৫৫০৮.৬৩ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১৯.৮১ শতাংশ। পূর্ত দপ্তরের (সড়ক ও সেতু, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি এবং জল সম্পদ) জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৩০৭০.৬৩ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১১.০৪ শতাংশ। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ২৩৫৭.০১ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৮.৪৮ শতাংশ। পঞ্চায়েত সহ গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ২২১৭.৯২ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৭.৯৮ শতাংশ। বাজেট প্রস্তাব পেশ করে অর্থমী প্রণজিৎ সিংহ রায় আজ দুপুরে বিধানসভার প্রেস কর্ণারে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বাজেটকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, ভবিষ্যৎমুখী ও বিকাশমুখী হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষের জন্য এই বাজেটে কিছু না কিছু রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের অর্থনীতি ভালো অবস্থায় রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজ্যের জিএসডিপি'র বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৪৯ শতাংশ যা জাতীয়স্তরে ছিল ৭.২০ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজ্যের অর্থনীতি ৮.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই সময়ে জাতীয় পর্যায়ে এই হার ৭.৩ শতাংশ।

রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই গুরুত্ব দিয়ে বাজেট তৈরি করা হয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ ।। বিধানসভায় আজ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা একটি জনকল্যাণমুখী, ভবিষ্যতের দিশারী এবং বিকাশমূলক বাজেট। রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই গুরুত্ব দিয়ে বাজেট তৈরি করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে মহিলা, শিক্ষার্থী, যুব সম্প্রদায়, তৃতীয় লিঙ্গ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গড়ে তোলা হবে, মোট ২৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। তৈদুতে ইন্দো-ডাচ প্রকল্পের আওতায় ৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি লেবুজাতীয় ফলের 'এক্সিলেন্স সেন্টার' এবং লেম্বছড়াতে ইন্দো-ইজরায়েল অ্যাকশন পরিকল্পনার আওতায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১টি ফুলের এক্সিলেন্স সেন্টার গড়ে তুলে রাজ্যে ফল, শাকসব্জি ও ফুলের বৈজ্ঞানিক চাষ এবং সর্বোত্তম মানের রোপণ সামগ্রী সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী জানান, মোট ১৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪টি মৎস্যচাষ জ্ঞান কেন্দ্র এবং ১টি রাজ্য মৎস্য সচেতনতা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। আরআইডিএফ'র প্রদত্ত ঋণে ২১টি মাধ্যমিকস্তরের বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ১২৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। পিএম-ডিভাইনের আওতায় মোট ১৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলা এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতাল পরিসরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাল্টিকেয়ার স্বাস্থ্য ইউনিট নির্মাণ করা হবে। তপশিলী জাতির ৪০০ জন শিক্ষার্থীকে ১ লক্ষ টাকা করে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৬

দগ্ধরাও সংকটাপন্ন

মনির হোসেন

ঢাকা,মার্চ ০১।। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডের বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় এই পর্যন্ত ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা.সামন্ত লাল সেন। এছাড়া, এই ঘটনায় দগ্ধ চিকিৎসাধীন সবাই সংকটাপন্ন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আগুন লাগার পর ভবনের বদ্ধ জায়গায় ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অনেকে মারা গেছেন। দগ্ধরা কেউ শঙ্কামুক্ত নন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আগুনে দগ্ধদের চিকিৎসার খোঁজ নিচ্ছেন। শুক্রবার সকাল পৌনে ৭টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে ফোন করে আহতদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর বেইলি রোডে অবস্থিত একটি বহুতল ভবনে আগুন লাগে। এতে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া, গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত ২২ জন। ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি ইউনিটের ২ ঘন্টার চেষ্টায় ১১টা ৫০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ৭৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে। ঘটনা তদন্তে ফায়ার সার্ভিস ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। আগুনের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে উদ্ধারকাজে সহায়তা করেছে পুলিশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য, এনএসআই, বিজিবি ও র‍্যাব।

এদিকে,বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণকারীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি আহতদের দ্রুত চিকিৎসা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেইলি রোডের বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নি নির্গমন পথ না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা করেছি, তবুও মানুষ এতটা সচেতন নয়। আপনি একটি বহুতল ভবনে আগুন দেখেছেন যার কোনো অগ্নি নির্গমন পথ ব্যবস্থা নেই। তিনি বলেন, বেইলী রোডে একটি বহুতল ভবন হলেও সেখানে কোন অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ছিল না। ভবন বা স্থাপনা তৈরির সময় তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মারপিটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ মার্চ ।। কৈলাসহরের বিদ্যানগরে মারপিটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজমান। বিদ্যানগর ১৭ নং ওয়ার্ড এলাকায় মারপিটের ঘটনায় উত্তপ্ত গোটা এলাকা। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে সরগরম গোটা এলাকা।

সংবাদে প্রকাশ, চলতি মাসের ২৭ তারিখ ওই এলাকার বাসিন্দা অনিশ সিনহা তার নিজ বাড়িতে তার এক বন্ধুকে নিয়ে মাংস রান্না করে খাচ্ছিল। অনীশ সিনহার অভিযোগ মাংস রান্না করার সময় নাকি ওই একই এলাকার বাসিন্দা সত্যজিৎ সিনহা নামে এক ব্যক্তি এসে অনীশ সিনহার সাথে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তী সময় উক্ত ঘটনার খবর পেয়ে অনীশ সিনহার নিকট আত্মীয় প্রশান্ত সিনহা ঘটনাস্থলে ছুটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অর্থনীতির বিকাশে কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে ঃ রাজ্যপাল

গোমতী জেলায় জেলাশাসক ও জেলা আধিকারিকদের সাথে রাজ্যপালের মতবিনিময়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ ।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ উদয়পুরে গোমতী জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা এবং জেলাস্তরের অফিসারদের সাথে মতবিনিময় করেন। গোমতী জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে আজ দুপুরে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা তড়িৎকান্তি চাকমা, জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, বিভিন্ন দপ্তরের জেলাস্তরের আধিকারিকগণ, জেলার বিভিন্ন মহকুমার মহকুমা শাসকগণ এবং বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ গোমতী জেলার জেলা সদর উদয়পুরে এসে পৌঁছালে জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা তাঁকে স্বাগত জানান। উদয়পুর সার্কিট হাউসে রাজ্যপালকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রিপার ও যাত্রীবাহী অটোর সংঘর্ষে আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ মার্চ ।। ট্রিপার ও যাত্রীবাহী অটোর সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে ৪ জন। বিশালগড় থানার অন্তর্গত ঢাকারবাড়ি এলাকায় স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সাথে সাথে দমকলবাহিনীদের খবর দিয়েছিলেন। দমকলবাহিনী আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে , আজ সকাল দশটা নাগাদ বিশালগড় থানার অন্তর্গত ঢাকারবাড়ি এলাকায় ট্রিপার ও যাত্রীবাহী অটোর সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে ৪ জন যাত্রী। এখানকার স্থানীয় মানুষ বিকট শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। স্থানীয় মানুষজন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সাথে সাথে বিশালগড় দমকলবাহিনীরকে খবর দিয়েছিলেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রেটার তিপরাল্যান্ড নয়, বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন, ইঙ্গিত প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। 'আগামীকাল" মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার দিল্লির উদ্দেশ্যে হঠাৎ চলে যাওয়ার খবরের মধ্যে তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট রাজ্যের পুরো রাজনৈতিক বৃত্তে ঝড় তুলেছে।

যখন কোনও পক্ষের কাছ থেকে কোনও স্পষ্ট তথ্যের প্রবাহ না থাকায় জল্পনাগুলি ঘন এবং দ্রুত চলছিল, সূত্র বলছে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দলের সাথে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারে যেখানে তাঁরা 'সাংবিধানিক সমাধান' স্লোগানটি ব্যবহার করে আসছে।

তিপরা মথা পার্টির সূত্র বলছে, "সম্ভবত, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের মধ্যে আলোচনা আগামীকাল চূড়ান্ত রূপ নেবে। বিরোধীদলীয় নেতা অনিমেষ দেববর্মা, দলের সভাপতি বি কে রাঙ্খল, বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, টিটিএএডিসি-র চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা এবং টিটিএএডিসি-র প্রধান নির্বাহী সদস্য (সিইএম) পিসি জামাতিয়ার মতো সিনিয়র নেতারা দিল্লি চলে গেছেন।

এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা এবং মুখ্য সচিব জে কে সিনহাও নয়াদিল্লি চলে গেছেন। প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, কেন্দ্রীয় সামাজিক বিচার ও ক্ষমতায়ন রাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এবং অন্যান্য সিনিয়র নেতারাও দিল্লিতে রয়েছেন। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং একমাত্র আইপিএফটি বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়াও জাতীয় রাজধানীর জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট ত্রিপুরাকে আগামীদিনে সমৃদ্ধিশীল বানাতে সাহায্য করবে ঃ সুব্রত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ ।। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট ত্রিপুরাকে আগামীদিনে সমৃদ্ধিশীল বানাতে সাহায্য করবে। এই বাজেট জনকল্যাণমুখী, ভবিষ্যতের দিশারী এবং বিকাশমূলক বাজেট। আজ বিজেপি মুখ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

এদিন তিনি বলেন, বাজেটে আর আই ডি এফ-এর অর্থানুকুল্যে ২১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। এরজন্য ১২৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

তাছাড়া , বাজেটে রাবার সিট প্রক্রিয়াকরণের জন্য রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ৫০টি 'স্মোক হাউজ' তৈরীর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এরজন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ৫০ আসন বিশিষ্ট ১১টি জনজাতি ছাত্রীদের জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর নির্যাতনে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১ মার্চ ।। স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতর জখম হওয়া গৃহবধূ আত্মহত্যা করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো যাত্রাপুর থানাধীন উত্তর মহেশপুরে। মৃতার নাম পলি রানী বনিক।

উত্তর মহেশপুরের স্কুল টিলা এলাকার খগেন বনিকের মেয়ের সাথে ধনপুরের বড়নারায়ণ এলাকায় অঞ্জন দাসের সাথে সামাজিকভাবে বিয়ে হয় বছর চারেক আগে। বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই স্ত্রীর উপর নির্যাতন শুরু করে বলে অভিযোগ। গত ২৯ শে জানুয়ারি পলিকে বেধড়ক মারধর করে স্বামী। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে এনে চিকিৎসা করানোর পর থেকে গত প্রায় এক মাস সময় ধরে বাপের বাড়িতে থাকতো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামুটিয়া ব্লকে অপরিশ্রুত পানীয় সরবরাহ, এলাকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ ।। অপরিশ্রুত পানীয় জল পান করে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেছেন। জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বহু মানুষ। বামুটিয়া ব্লকের অন্তর্গত উত্তর বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামে অপরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে। অথচ ডিপ টিউবওয়েল, পাইপ লাইন, জলের ট্যাপ এবং আইরন রিমুভার প্লান্ট রয়েছে।

কিন্তু পরিষেবা সচল না থাকায় প্রতিদিন আয়রন যুক্ত ঘোলা জল খেতে হচ্ছে এলাকার মানুষকে। স্থানীয়দের দাবি এলাকাতে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক দপ্তর। বামুটিয়ার ব্লকের অন্তর্গত উত্তরবামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জলিলপুর এলাকায় একটি পানীয় জল সরবরাহের পাম্প রয়েছে। বহু বছর আগে এই পাম্পটি স্থাপন করা হয়েছিল।

এই জলের পাম্প থেকে বামুটিয়া বাজার, ভোগজোড়, বড় আমতলী সহ বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। প্রায় ১০ বছর আগে এই ওয়াটার পাম্পের সাথেই একটি আইরন রিমুভার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এখন পর্যন্ত এই আয়রন রিমুভার প্লান্ট ব্যবহার করা হয়নি।

এই বিষয়ে দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় যে বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার থেকে এই ওয়াটার পাম্পে সংযোগ এসছে তা থেকে এই আয়রন রিমুভার প্লান্ট চালানো সম্ভব না। নতুন বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার বসিয়ে এই আয়রনের প্লান্ট থেকে পরিষেবা দিতে হবে। স্থানীয়দের দাবি এই জলের পাম্প থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে শুরু হল ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ ।। আজ থেকে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এ বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম দিনে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা ফাজিলের পরীক্ষার্থীরা ইংরেজি পরীক্ষা দিয়েছে। দুপুর ১২টায় শুরু হয়েছে এই পরীক্ষা।

প্রসঙ্গত, আজ থেকে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পরীক্ষা ৩০ মার্চ শেষ হবে। এবছর উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৫, ৩৪৫ জন। রাজ্যের ৬০টি কেন্দ্র এবং স্থান ৯৮টি পরীক্ষা চলছে। এরই মধ্যে ধলাই জেলায় ৭টি কেন্দ্র, ১০টি ক্ষেত্র এবং ৩৪টি স্কুলে পরীক্ষা হবে। গোমতী জেলায় ৬টি কেন্দ্র, ২২টি ক্ষেত্র এবং ৪৫টি স্কুলে পরীক্ষা হবে। খোয়াই জেলায় ৩টি কেন্দ্র, ৭টি ক্ষেত্র এবং ৩৭টি স্কুলে পরীক্ষা হবে।

তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫টি কেন্দ্র, ১৩টি ক্ষেত্র এবং ৪৬টি স্কুলে পরীক্ষা হবে। সিপাহীজলা জেলায় ৮টি কেন্দ্র, ১৩টি ক্ষেত্র এবং ৬৫টি স্কুলে পরীক্ষা হবে। দক্ষিণ জেলায় ৮টি কেন্দ্র, ১৪টি ক্ষেত্র এবং ৭০টি স্কুলে পরীক্ষা হবে। উনকোটি জেলায় ৩টি কেন্দ্র, ৬টি ক্ষেত্র এবং ২৯টি এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২০টি কেন্দ্র, ২৩টি ক্ষেত্র এবং ৯৭টি স্কুলে পরীক্ষা হবে বলে জানান তিনি।

সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আজ নির্বিঘ্নে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। সিপাহীজলা জেলাজুড়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা ফাজিল পরীক্ষার প্রথম দিনের ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষা। শুক্রবার পরীক্ষা চলাকালীন সোনামুড়ার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে এসে একথা জানিয়েছেন সিপাহীজলা জেলার শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক। তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০◘ সংখ্যা ১৪৩ ◘ ২ মার্চ ২০২৪ ইং ◘ ১৮ ফাল্গুন ◘শনিবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ গঠনই হোক অঙ্গীকার

সমাজ হইতে কুসংস্কার দূর করিয়া সমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক করিয়া তোলাই হোক অন্যতম ভাবনা। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে অগ্রসর করিলেও এখনো পর্যন্ত সমাজ হইতে নানা কুসংস্কার দূর করা সম্ভব হয় নাই। এর দায় আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না। সমাজ হইতে কুসংস্কার দূর করিতে না পারিলে সমাজব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। কুসংস্কার আচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থায় নানা অনাচার ব্যভিচার সহ অঘটন ঘটিয়া চলে। সেই কারণেই সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা প্রয়োজন। সমাজের প্রতিটি মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত করে বিজ্ঞানমনস্ক করিয়া তুলিতে পারিলে দেশ রাজ্য ও সমাজ ব্যবস্থা আরও একধাপ উন্নত হইবে। বিজ্ঞান প্রেক্ষাপট আলোচনা করিলে দেখা যায়, দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞানীদের অবদানকে চিহ্নিত ও স্বীকৃতি দিতে প্রতি বছর ভারতে ”জাতীয় বিজ্ঞান দিবস” উদযাপিত হয়। ১৯২৮ সালে তিনি রামন এফেক্ট আবিষ্কার করেন। এ জন্য ১৯৩০ সালে তিনি পদার্থে নোবেল পুরস্কার জিতেন।১৯৮৬ সালে ”ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কমিউনিকেশন” এই দিনটিকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসেবে ধার্য করে। পরের বছর অর্থাৎ, ১৯৮৭ সালে এটি প্রথম পালিত হয়। এরকম একটি দিন ভাবা হয় দেশের তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে।ভেঙ্কট রামন-এর রামন এফেক্ট আবিষ্কারের সম্মানে এই বিশেষ দিন উদ্‌যাপন করা হয় ভারতে।১৯২৮ সালে এই যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন রামন। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৩০ সালে রামন পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।এবছরের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের থিম হল ”টেকসই ভবিষতের জন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি”চেন্নাইয়ে বড় হওয়া রামন ছোটবেলা থেকে বড়াবরই মেধাবী ছিলেন।বাবা ছিলেন একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক। সিভি রামন মাদ্রাজের তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯০৫ সালে গণিতে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক হয়েছিলেন।এই কলেজেই তিনি এমএতে ভর্তি হন।রসায়ন ছিল তাঁহার প্রধান বিষয়।মাস্টার অফ সায়েন্স করিবার পর তিনি চলিয়া আসেন কলকাতায় শিক্ষকতা করিবার জন্য।কিছুদিন পর তিনি শিক্ষকতা ছাড়িয়া যোগ দেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা কালটিভেশন অফ সায়েন্সে।এরপর এটাই হইয়া ওঠে তাঁহার বিজ্ঞান সাধনার প্রধান ক্ষেত্র।সেখানে ১৯০৭ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি তাঁহার গবেষনার কাজ চালাইয়া যান। ১৯২১ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হয় ওয়ার্ল ইউনিভার্সিটি কংগ্রেস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে যোগ দেন রমন। এটাই রমনের প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। কয়েক দিনের এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণেই তাঁর সঙ্গে দেখা হইল থমসন, রাদারফোর্ড, ব্র্যাগ সহ আরও অনেক বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীর।১৯২১ সালে এক বার জাহাজে করিয়া তিনি লন্ডন থেকে দেশে ফিরিয়াছিলেন।তখন তিনি খেয়াল করেন সমুদ্রের জলের রং নীল।তিনি জানিতেন আকাশের রংও নীল লাগে, কারণ আকাশের বিশেষ বর্ণ ছটার জন্য।কিন্তু সমুদ্রের রং কেন নীল! এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গিয়াই তিনি আবিষ্কার করেন ‘রমন এফেক্ট’।

লম্বা গবেষণার পর অবশেষে ১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি সূত্র আবিষ্কার করেন। ১৬ মার্চ আনুষ্ঠানিক ভাবে এই সূত্র প্রকাশ করেন তিনি।সমুদ্রের জল নীল কেন ! তবে কি সমুদ্রের জলে আকাশের রঙের প্রতিফলন হয় বলিয়াই সমুদ্রের জল নীল! এই তত্ত্ব মানিলেন না রামন। কারণ রামন দেখিলেন পোলারাইজিং প্রিজমের মাধ্যমে আকাশের প্রতিফলন আড়াল করিবার পরেও দেখা গেল সমুদ্রের জলের রং নীল। আসলে সমুদ্রের জল নিজেই আলো বিচ্ছুরণ করে, তাই জলের রঙ নীল।রমন এফেক্টের সূত্র ধরিয়াই আসিয়াছে একবর্ণা আলোকের ধর্ম, লেসার রশ্মি ইত্যাদি।১৯২৮ সালে এই যুগান্তকারী আবিষ্কার জন্য ১৯৩০ সালে রামন পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।

ঢাকার বহুতলে বিধ্বংসী আগুনে মৃত্যু ৪৩ জনের, বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন

ঢাকা, ১ মার্চ (হি.স.): বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডের একটি বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন ৪৩ জন। অগ্নিকাণ্ডে আহত ও জখম হয়েছেন বহু মানুষ, ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন বলেছেন, আগুনে ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বার্ন ইনস্টিটিউটে এখনও পর্যন্ত ১০ জন মারা গিয়েছেন। অপরদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩৩ জন মারা গিয়েছেন।

ঢাকার দমকল বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ ঢাকার বেইলি রোডে অবস্থিত একটি সাততলা ভবনে আগুন লাগে। বাড়িটি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হত। ওই বহুতলটিতে খাবারের দোকান ছাড়াও জামাকাপড়, মোবাইল এবং অন্যান্য দোকান ছিল। বহুতলটির দ্বিতলে একটি বিরিয়ানির দোকান ছিল। মোট ১৩টি ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রায় দু’ঘন্টার প্রচেষ্টায় রাত ১১টা ৫০মিনিট নাগাদ আগুন নেভাতে সক্ষম হন দমকলকর্মীরা। আগুন নিভিয়ে ফেলার পর শুরু হয় উদ্ধারকাজ। দমকল বিভাগের আধিকারিক মহম্মদ মইনুদ্দিন জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে প্রথম এবং দ্বিতলে সর্বপ্রথম আগুন লাগে। আগুন ক্রমে উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। নীচ থেকে উপরের দিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় বাড়িটির মধ্যেই অনেকে আটকে পড়েন। আগুন এবং ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচতে অনেকে ছাদে গিয়ে আশ্রয় নেন। বহুতলটির ভিতর থেকে মোট ৭৫ জনকে জীবিত অবস্থায় বাইরে বার করে আনা গিয়েছে।এই অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। বেইলি রোডে কাচ্চি ভাই নামে একটি রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সূত্রপাত জানতে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে দমকল বিভাগ। কমিটির সভাপতি হলেন- লে. কর্নেল মহম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স)। এছাড়া সদস্য সচিব মো. ছালেহ উদ্দিন, উপপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জোনের ডিএডি, সিনিয়র স্টেশন অফিসার এবং ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর।

৫-৮ মার্চ দুই দেশ সফরে যাচ্ছেন এস জয়শঙ্কর, বিদেশমন্ত্রী যাবেন দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানে

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.): বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর আগামী ৫-৮ মার্চ দুই দেশ সফরে যাচ্ছেন। মার্চের শুরুতেই দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। ৫-৬ মার্চ প্রথমে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল যাবেন তিনি, সেখানে দশম ভারত-রিপাবলিক অফ কোরিয়া জয়েন্ট কমিশন বৈঠকে সহ-সভাপতিত্ব করবেন। দক্ষিণ কোরিয়ায় আরও বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের।

দক্ষিণ কোরিয়া সফর শেষে ৬-৮ মার্চ জাপান সফরে যাবেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। ষষ্ঠদশতম ভারত-জাপান বিদেশমন্ত্রীদের কৌশলগত সংলাপে অংশ নেবেন তিনি। জাপানের বিদেশমন্ত্রী ইয়োকো কামিকাওয়া এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ভারত ও জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক গুরুত্বের বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং মুক্ত, উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য সহযোগিতার বিষয়ে মতামত বিনিময় করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

‘নজরুল সঙ্গীত’ সুরের ধারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ডা. দীপা দাস

দুই বাংলার দুই রূপ, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে একই নজরুল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটতো বা এরকম ধারণা করা হত। নজরুলগীতির ভবিষ্যৎ পশ্চিমবঙ্গে এই বিষয়ে সাধারণত অনেক গবেষণা হয়েছে এবং আলোচনা ও সেমিনার হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বহু নবীন শিল্পীর কণ্ঠে যা শোনা যায়, তা নজরুল ইসলামের মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শোনায় না। এমনকি রাগ, মাত্রা, তালেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক বাংলা গান আর জনরুল সঙ্গীত এক নয়। একথা ঠিক সেই সময়ে কিবির গানকে আধুনিক গান বলা হতো কিন্তু আধুনিক গান নামে পরিচিত গানের সঙ্গে নজরুলগীতিরকি তফাৎ সে কথা কাজী নজরুল ইসলাম নিজেই বলে গেছেন, তাঁর ‘সুর, ও শ্রুতি’ প্রবন্ধে। সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থসিদ্ধি বা পেশার জন্য কবি ঘনিষ্ঠ বা ট্রেনার আধুনিক গানের দিকে ঠেলে দেওয়ার চক্রান্ত করে কবির হৃদয়ে আঘাত করেছেন। এই জন্য তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে লিখেছিলেন-‘দেখ আমি তোমাদেরহাতে আমার সৃষ্টিকে দিলাম যদি পারো এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে তাহলে ততটুকুই করবে, এর বিকৃত রূপ না হয়। কবি স্নেহধন্য বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের একটি লেখায় জানা যায়, কবি নজরুল তাঁর গানের সুর ও গায়কী বিষয়ে এই বলতেন। নজরুল সঙ্গীত গাওয়ার জন্য উপযুক্ত হতে হবে। তার কারণ কণ্ঠ সাধনা- রাগ পরিচয় ছাড়া নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করা সম্ভব নয়। কবি নিজে অসংখ্য শিল্পীকে ট্রেনিং করিয়েছেন, গানও রেকর্ডিং করিয়েছিলেন। যেমন আঙ্গুরবালাদেবী, ইন্দুবালাদেবী, কমলা ঝারিয়া, কে মল্লিক, ধীরেন দাস, শৈলদেবী, ইলা ঘোষ, রাধারাণীদেবী, যূথিকা রায়, দীপালি তালুকদার, কমল দাশগুপ্ত, সুধীরা দাশগুপ্ত, সত্য চৌধুরী, রঞ্জিত রায়, বিমল গুপ্ত, হরিমতিদেবী, আব্বাস উদ্দিন আহমদ, আশ্চর্যময়ী দাসী, অনিমা বাদল, মিস্ লাইট, মানিকমালা, মৃণালকান্তি ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, নিতাই ঘটক, সুপ্রভা সরকার, বেচু দত্ত, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, মড কস্টোলা, কানন দেবী, প্রমোদা দেবী, সিতারা দেবী প্রমুখ। আকাশবাণী ও গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য কবিকে প্রয়োজনে সহকারী বা ট্রেনারের সাহায্য নিতে হয়েছিল। তাঁর অন্যতম শিষ্য নিতাই ঘটক ১৯৯৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মারা যান। এছাড়াও ছিলেন ধীরেন দাস, কমল দাশগুপ্ত, চিত্ত রায়, জগৎ ঘটক, গিরিশ চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন সেন, আব্বাস উদ্দিন আহমদ প্রমুখ। শিল্পীদের মধ্যে উৎসাহ প্রদান করতে প্রয়োজনে মূল গানকে অক্ষত রেখে কিছু রং লাগাতে পারতেন ট্রেনারগণ। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় আকাশবাণী ও দূরদর্শনে গাওয়ার সময় অনেকেই নজরুলের মূল সুর থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। অথচ ষাটের দশকেই এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে নজরুল গবেষক, ভক্ত অনুরাগী, শিষ্য শিষ্যরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কাছে স্মারকপত্র ও আবেদন জমা দিয়েছিলেন। খুব দুঃখের বিষয় তখন বা এখনও কেউ যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল রাজ্য সঙ্গীত আকাডেমি তখন গঠিত হলেও তারা কিন্তু এর শুদ্ধতার প্রশ্নে উদাসীন ছিলেন। কর্তৃপক্ষের তেমন সহযোগিতা বা সাড়া কোনোদিনই পাওয়া যায়নি। নজরুল গবেষক কল্পতরু সেনগুপ্তের বই থেকে সবিস্তারে এই তথ্য পাওয়া যায়। বাংলা ভাষা যেমন দুই বাংলার তেমন নজরুলও দুই বাংলার সেটা স্মরণে রেখে ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধি দল কলকাতায় এসেছিলেন। নজরুলগীতি ও নজরুল চর্চা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং পশ্চিমবঙ্গে নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ও গবেষকদের মত বিনিময় করতে। দুই বাংলায় নজরুল চর্চায় সমন্বয় সাধনেও পারস্পরিক সহযোগিতায় তাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন। নজরুল চর্চা সম্পর্কে অবহিত হওয়া, দুই বাংলার পারস্পরিক সহযোগিতায় কিভাবে নজরুল ইসলামের সব গান ও সুর উদ্ধার করা যায় তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাঁরা বাংলাদেশের নজরুল চর্চা, প্রকাশনা, গবেষণাও অন্যান্য কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। এই প্রতিনিধিদের নেতৃত্বে ছিলেন নজরুল গবেষক অধ্যাপক করুনাময় গোস্বামী এবং প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন রিজিয়া আহমদ, সেকান্দর শওকত হোসেন, বেগম নাসরিন নাহার, মোখলেছুর রহমান প্রমুখ। তারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর সঙ্গে ও সাক্ষাৎ করেন। নজরুল স্মৃতি রক্ষার্থে এই কাজটি সব থেকে বেশি প্রয়োজন ছিল। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হলো যে আলোচনা করার পর সিদ্ধান্তগুলি যদি কার্যকর করা এবং চর্চা বিনিময় চালু রাখা সম্ভব হতো তাহলে নজরুল সঙ্গীত চর্চায় বর্তমান সময়ের শিল্পীদের বিভ্রান্তীকর এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হতো না। একারণেই বর্তমান সময়ে কিছু গানের সুর বদল ও বিকৃতি আমরা দেখতে পাচ্ছি বা একটি গানে দুটি সুরের উদ্ধার। একথা ঠিক কবি সুস্থ অবস্থায় একটি গানকে দুবার রেকর্ড করিয়েছেন। কখনো নিজে সুর দিয়েছেন এবং অন্যান্যকে দিয়ে রেকর্ড করিয়েছেন।

কিন্তু বর্তমানে প্রায় তিন-চারশো গানের সুর বদলে গেছে কিন্তু সেই সুরের আসল তথ্যের কোনো প্রমাণ নেই। সাধারণত রাগ ভিত্তিক সঙ্গীত বা লোকসঙ্গীতে তেমন পরিবর্তন ঘটেছে এমনটি নয়। ১৯৯৫ সাল থেকেই যদি দুই বাংলা এক হয়ে নজরুল নিয়ে সঠিত চর্চা করা সম্ভব হত তাহলে আজ বর্তমান সময়ে নজরুল সঙ্গীত চর্চায় পশ্চিবঙ্গের শিল্পীরা আরও উৎসাহিত হতো। সঠিক সুর ধরে রাখা যদি সম্ভব হতো দুই বাংলার শিল্পীরা আরো উৎসাহিত হতেন। মূল সুর নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন নজরুল গবেষক ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। তিনি পশ্চিবমঙ্গে কবির জন্মস্থান পুরুলিয়া ও বিভিন্ন জায়গায় থেকে অরিজিনাল গান, সুর, অপ্রকাশিত লেখা সংগ্রহ করে বাংলাদেশের জনরুল গবেষকদের দিয়ে সাহায্য করেছেন। সম্প্রতি ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের পরিবারের কাছে শেষ চিঠিতে চা লিখেছিলেন সুধীন দাশ। উল্লেখযোগ্য এই যে নয়ের দশকের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থেকে নেওয়া কিছু তথ্য বা দৃষ্টান্ত জানাতে চাইছি। পশ্চিমবঙ্গে এক উল্লেখযোগ্য দিক নজরুলগীতি নির্ভর নৃত্য রূপায়ণ। সম্প্রতি একশো বছরের বিখ্যাত কবিতা ‘বিদ্রোহী’ ও ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ কবিতার নৃত্য রূপ, ‘কথাকলি’ নৃত্য রূপায়ণ করেছিলেন, বিখ্যাত ওড়িশী নৃত্য শিল্পী পৌষালী মুখোপাধ্যায়। নজরুল সঙ্গীতের সঙ্গে কথক নৃত্যু শৈলী নিয়ে রূপায়ণ করেছিলেন বিখ্যাত নৃত্য শিল্পীও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেলা অর্নব। নজরুল সৃষ্ট নবরাগ থেকে রেকর্ড ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র অনবদ্য। বিংশ শতাব্দীর নয়ের দশক নজরুল সঙ্গীত চর্চা অন্য রূপ নিয়েছিল কিন্তু সমস্যা হয়েছে শ্রদ্ধাশীল প্রকৃত মানুষের অভাবে সঠিক রাস্তা রাওয়া যায়নি। এখন নজরুল সঙ্গীত চর্চা কেন্দ্র স্থল সীমান্তের কাঁটাতারের এপার ওপার। নজরুলের জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গ ও তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী দুই বাংলায় ছড়িয়ে, তাঁর অগণতি ভক্ত বিশ্বজুড়ে এবং সেই সমস্ত শ্রোতাদের কান ও চোখ চাতক পাখির মত। তাদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সঠিক সুর পাওয়া নিয়ে। এর মধ্যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কস, চ্যানেল ইউটিউব কিছুটা হলেও স্বস্থি দিয়েছে যে এখানে খুঁজলে কিছু না কিছু পাওয়া যায়। সঙ্গীত গুরুমুখী বিদ্যা, শিল্পীরা গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁরাই সত্য ও তথ্য, ইতিহাসকে বহন করেন। গবেষণার উপর গবেষণা অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ চর্চা করার চেষ্টা, নজরুল চর্চাকে বর্তমান থেকে সুদূর প্রসারী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই নজরুল চর্চাকে বর্তমান থেকে সুদূর প্রসারী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই নজরুল সঙ্গীতের উপযুক্ত শিক্ষণ শিবির করে তার আসল রূপ জনসাধারণ বা শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব সবাইকে নিতে হবে, বিশেষত সরকারকে। তাতেই আমরা সবাই সমৃদ্ধ হব এবং নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সেটাই হবে উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাহলে ‘কারার ঐ লৌহকপাট’ গানের মত আর বিতর্ক ঘটবে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

একটি প্রাচীন সাম্রাজ্যের শক্তিশালী নারীরা

লিনা জেল্ডোভিচ

আক্রমণকারীরা উত্তর থেকে এসেছিল। দক্ষতার সঙ্গে তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা এসেছিল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। তারা ফসল নষ্ট করে দিয়েছিল, পুড়িয়ে দিয়েছিল। চীনের উত্তর সীমান্তের বসবাসকারী হানরা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ওই ফসলের পরিচর্যা করে এসেছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০ বছর থেকে।

চীনের হানরা ওই অনুপ্রবেশকারীদের ‘শিয়ানু’ বলে অভিহিত করেছিল, যার অর্থ ‘উগ্র দাস’। বর্বরদের ‘নিকৃষ্টতা’ জোর দিয়ে বোঝাতেই ওই অবমাননাকর শব্দের প্রয়োগ করা হয়।

তবে, বাস্তবে সামরিক এবং রাজনৈতিক দক্ষতার নিরিখে তাদের চীনা প্রতিবেশীদের অতিক্রম করেছিল শিয়ানু। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সমন্বয়ে গঠিত ”শিয়ানু” বিশ্বের প্রথম যাযাবর সাম্রাজ্য। তারা এতটাই সুসংগঠিত আর শক্তিশালী ছিল যা চীনের হানদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেছিল এবং পরবর্তীতে তাদেরকে চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিতেও বাধ্য করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দক্ষ শিয়ানু ধনুকধারীদের পিছনে ছিল শক্তিশালী শিয়ানু নারীরা যারা সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। শিয়ানু”র ইতিহাসকে একত্রিত করা কঠিন কাজ ছিল কারণ সাংগঠনিক, সামরিক দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও, তাদের লিখিত ভাষার বিকাশ ঘটেনি। জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইন্সটিটিউটের আর্কিওজেনেটিক্স বা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি দলের প্রধান ক্রিস্টিনা ওয়ারিনার বলেন, ’আমরা শিয়ানু সম্পর্কে যে সব তথ্য জানি তার বেশিরভাগই তাদের সমাধিস্থল এবং শত্রুদের কাছ থেকে আসা।” সমাধিস্থলগুলি থেকে অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্যই পাওয়া যায়, যেমনটা জানা গিয়েছে সাম্প্রতিক একটি গবেষণা থেকে। ওই গবেষণা মতে, সমাধিস্থলে নারীদের দেহাবশেষই বেশি রয়েছে।

মঙ্গোলিয়ার শিয়ানু সমাধিস্থল খননকারী প্রত্নতাত্ত্বিকরা দীর্ঘদিন ধরে মনে করেন যে বেশ কয়েকটি অভিজাত এবং বিস্তৃত সমাধিতে যে দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, তার অধিকাংশই নারীদের। যদিও বছর কয়েক আগে জেনেটিক সিকোয়েন্সিং প্রযুক্তি আসার পরই মিজ ওয়ারিনারের নেতৃত্বাধীন দলটি নিশ্চিত ভাবে বলতে পেরেছিল যে ওই দেহাবশেষ নারীদের। বিজ্ঞান সাময়িকীতে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে তাদের গবেষণা প্রকাশিত হয়।

জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর জিওনথ্রোপোলজির প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর এবং ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ মঙ্গোলিয়ার প্রধান, জামস্রঞ্জভ বায়ারসাইখান বলেন, ’আমাদের জিনগত অনুসন্ধান প্রমাণ করে যে অভিজাত রাজকুমারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিকভাবে শিয়ানু সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।” কীভাবে নারীরা শিয়ানুদের অঞ্চল প্রসারিত করতে এবং যাযাবর সাম্রাজ্যকে একত্রিত করতে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ভূমিকা রেখেছিল, সে বিষয়ে এই অনুসন্ধানগুলি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে।

সাধারণত আমরা সাম্রাজ্যগুলিকে স্থাবর ভেবে থাকি যেখানে শাসনের সুবিধায় প্রাসাদ, শহর, আদালত, ইত্যাদি বানানো হয় কিন্তু কিছু যাযাবর সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিপুল।

বিখ্যাত চেঙ্গিস খান সাম্রাজ্যের প্রায় এক হাজার বছর আগে, শিয়ানু সাম্রাজ্য ছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এবং এটি আধুনিক মঙ্গোলিয়ার ওই অঞ্চলটি দখল করেছিল, যার উত্তর সীমানা বর্তমান রাশিয়ার বৈকাল হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দক্ষ যোদ্ধা হওয়ার পাশাপাশি, শিয়ানুরা বিলাসবহুল পণ্যগুলির প্রতিও আগ্রহী ছিল। চীনা রেশম, রোমান কাচ, মিশরীয় মালাসহ বিভিন্ন পণ্য ইউরেশিয়া থেকে প্রাচীন সিল্ক রোডের মাধ্যমে নিয়ে আসা হতো। অভিজাত শিয়ানু নারীরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল এবং রাজনৈতিক বিষয়েও পারদর্শী ছিল। এক অর্থে, শিয়ানু নারীরা ছিল সেই ‘অদৃশ্য আঠা’ বা ‘রেশম সুতো’ যা কোনও স্থায়ী বসবাসস্থল বা শহর না থাকা একটি যাযাবর সাম্রাজ্যকে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ব্রায়ান মিলার যিনি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইন্সটিটিউটের সঙ্গেও যুক্ত, তিনি বলেন, ’শিয়ানু নারীরা সীমান্তে বিশেষ শক্তিশালী পদে ছিল। শিয়ানু ঐতিহ্য বজায় রাখার পাশাপাশি ক্ষমতার রাজনীতি, সিল্ক রোড নেটওয়ার্কের মতো বিষয়েও মাথা ঘামাতো। তারা খুবই সম্মানীয় ছিল।”

’নারীদের সমাধি থেকে উদ্ধার করা সামগ্রীগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতা আর নেতৃত্বের প্রতীক,’ ক্রিস্টিনা ওয়ারিনার যোগ করেন। গবেষকরা পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার খোভদ প্রদেশের মানখান জেলায় অবস্থিত তাখিলতিন খোতগোরের অভিজাত সমাধিস্থলে স্মৃতিস্তম্ভ খুঁজে পেয়েছেন যা স্পষ্টতই নারীদের সম্মান জানাতে নির্মিত। সূর্য ও চাঁদের রাজকীয় প্রতীক দিয়ে সজ্জিত কফিনে শায়িত নারীদের সমাধিগুলি সাধারণ পুরুষদের সমাধি দিয়ে পরিবেষ্টিত। একটি স্মৃতিসৌধে ছয়টি ঘোড়াসহ একটি রথও ছিল।

একইভাবে, নিকটবর্তী শোম্বুজিন বেলচির সমাধিস্থলে সবচেয়ে অভিজাত সমাধিস্থলগুলি নারীদের; যেখানে তাদের বিলাসবহুল সামগ্রী যেমন চীনা আয়না, সিল্কের পোশাক, কাঠের গাড়ি, জপমালা, উৎসর্গ করা পশুসহ বিভিন্ন বস্তু রাখা রয়েছে।

সমাধিগুলি উল্টানো পিরামিডের মতো দেখতে যা মাটির উপরের দিকে আয়তক্ষেত্রের আকার নিয়েছে (প্রত্নতাত্ত্বিকরা যাকে টেরেস বলেন) এবং ভূগর্ভের দিকে ক্রমশ সংকীর্ণ। জার্মানির লাইবনেত সেন্টার ফর আর্কিওলজির প্রত্নতাত্ত্বিক উরসুলা ব্রোসেডার বলেন, “খননের পর পাওয়া এই সমাধি উল্টো পিরামিডের মতো যা মাটির ২০ মিটার নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত।”

প্রত্নতাত্ত্বিকরা শিয়ানু সমাধিস্থলে সুন্দর কোমরবন্ধ খুঁজে পেয়েছেন, যা উচ্চ সামাজিক মর্যাদার প্রতীক ছিল। উরসুলা ব্রোসেডার বলেন যে বড় বড় ফলক, পুতি ও পাথরে সজ্জিত কোমরবন্ধগুলি অনেকটা দেখতে ক্রিসমাস ট্রি”র মতো যার মধ্যভাগ থেকে সুসজ্জিত ঝুলন্ত বস্তু রয়েছে। ’কোমরবন্ধ সম্মান আর পদমর্যাদার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক, তবে এটি সাধারণত পুরুষদের ব্যবহারের জন্য, নারীদের জন্য নয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ওই নির্ধারিত সময়ে শিয়ানু নারীদের কোমরবন্ধ দেওয়া হয়েছিল, যদিও পুরুষদের কিন্তু সেভাবে দেওয়া হয়নি,” তিনি ব্যাখ্যা করেন। শিয়ানুদের অন্যতম প্রধান দক্ষতা ছিল ঘোড় সওয়ারি আর তীর-ধনুকের ব্যবহার। ’অনেকে ঘোড়াকে ভূমির জাহাজ বলেন, কারণ শিল্পায়নের আগে জাহাজ আর ঘোড়া ছিল সবচেয়ে দ্রুতগামী,’ ক্রিস্টিনা ওয়ারিনার বলেন। শিয়ানুরা ঘোড়াকে গৃহপালিত পশুর মতো লালন-পালন করতো, তারা ‘স্টেপ’ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল এবং ঘোড় সওয়ারির সময় লক্ষ্যবস্তু স্থির করে তীরন্দাজী করাও অনুশীলন করেছিল। ফলে কাছে ও দূরের প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল।

চীনা হানরা তাদের সমকক্ষ ছিল না। ’এমন কি যখন তারা চীনের মহাপ্রাচীর তৈরি করেছিল, সে সময় এটি তেমন কাজ করেনি। শিয়ানুরা শুধু তার চারপাশে ঘুরতো,’ মিজ ওয়ারিনার বলেন।

শিয়ানু নারীরা তীর-ধনুক চালানো, ঘোড় সওয়ারিতে পারদর্শী ছিল কিন্তু যুদ্ধের সময় কোনও পুরুষকে অনুসরণ করতো কি না সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

কিছু নারীর সমাধিতে অশ্বারোহী সরঞ্জাম ছিল, তবে গবেষকরা নিশ্চিত নন যে যুদ্ধক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি লড়াই করেছিল কি না।

’আমি মনে করি এই তথ্যটি বাদ দেওয়া উচিত নয় যে সেখানে যোদ্ধা হিসাবে নারীরাও ছিল,’ উরসুলা ব্রোসেডার বলেন। ’এর অর্থ এই নয় যে সমস্ত নারীরাই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। তবে তারা অবশ্যই ঘোড়ায় চড়তে ও তীর-ধনুক চালাতে পারতো, যদিও তা হয়ত ‘স্টেপ’ অঞ্চলে আরও ভাল জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে,” তিনি বলেন। জিনগত গবেষণা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের দলকে আরও একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য আবিষ্কার করতে সহায়তা করেছিল। চীনের নিকটবর্তী সাম্রাজ্যের সীমান্তে সমাধিস্থ নারীরা জিনগতভাবে আশেপাশের শিয়ানু জনসংখ্যার চেয়ে খুব আলাদা ছিল। শিয়ানুদের কোনও এক রাজা যার সমাধি ২০১৩ সালে মধ্য মঙ্গোলিয়ায় খনন করে উদ্ধার করা হয়, তার সঙ্গে ওই নারীদের নিকট আত্মীয়তা ছিল বলে মনে করেন গবেষকরা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অংশ হিসাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

নিউ করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনটিকে করা হবে পুনর্বিকাশ

মালিগাঁও, ১ মার্চ, ২০২৪: উত্তর পূর্বাঞ্চল ও অসমে রেলওয়ে সা-সুবিধাগুলি আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০২৪-২৫-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে রেলওয়ে পরিকাঠামোর প্রকল্পগুলির জন্য ১০,৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ৯১টি স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধাযুক্ত করে পুনর্বিকশিত করা হবে। নির্বাচিত স্টেশনগুলির মধ্যে অসমের নিউ করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ৩০.০০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে এক উল্লেখযোগ্য নতুন রূপ লাভ করবে।

এই স্টেশনটির পুনর্বিকাশের ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির রেল ব্যবহারকারীরা অত্যাধুনিক সুবিধা লাভ করবেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত নিউ করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হল আসামের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন যা করিমগঞ্জ জেলার জনসাধারণকে পরিষেবা প্রদান করে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত ওয়েটিং হলের পাশাপাশি বিদ্যমান স্টেশন ভবনটি উন্নত সম্মুখ অংশ সহ সম্প্রসারণ করা হবে। অন্যান্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যেমন লিফ/এস্কালেটর এবং এফওবি এবং ক্যাফেটেরিয়া সুবিধা এবং মডার্ণ সাইনেজ-এর পাশাপাশি জলের ফোয়ারা সহ সার্কুলেটিং এরিয়াতে নতুনকরে আলোর ব্যবস্থা করা হবে।

নতুন টয়লেট ব্লকটি পুরুষ ও মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে নির্মাণ করা হবে। সার্কুলেটিং এরিয়ার সৌন্দর্যায়ন সহ উন্নতমানের পার্কিং সুবিধার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। যাত্রীদের সহজ চলাচলের জন্য প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মে শেল্টার প্রদান করা হবে এবং মার্বেল পাথর, টাইল ইত্যাদি দিয়ে নতুনভাবে সারফেস নির্মাণ করা হবে। আগমন ও প্রস্থানের পথ পুনঃউন্নয়ন করা হবে, যার ফলে যাত্রীরা উন্নতমানের পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারবেন।

উপরোক্ত সকল কাজের জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। নতুন স্টেশন ভবনের ফাউন্ডেশনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। অন্যান্য যাত্রী সুবিধার জন্য কাজ যেমন কোচ গাইডেন্স বোর্ড, ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম, উন্নত সড়ক এবং ডিভাইডার ও দিব্যাঙ্গজনের জন্য সহজলভ্য ওয়াটার বুথের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্যও কাজ চলছে।

এই স্টেশনটির উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে এবং সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের যাত্রীদের ভ্রমণ সহজ করে তুলবে। পুনর্বিকশিত স্টেশনটি উক্ত এলাকার আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

বাড়ির অদূরে আমগাছে পাটকলের শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

হুগলি, ১ মার্চ (হি.স.) : মগরা এলাকার ছোট খেজুরিয়ায় শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে আমগাছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল এক পাটকলের শ্রমিকের। মৃতের নাম অভিজিৎ রায় (৩৬)। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরের একটি পাটকলে কাজ করতেন।

অভিজিতের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিজিতের হাতে পেন দিয়ে লেখা ছিল, "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।"স্থানীয় সূত্রে খবর, স্ত্রী, সাত বছরের পুত্র এবং চার বছরের কন্যাকে নিয়ে থাকতেন অভিজিৎ। পাটকলে কাজ করে বড় আয় করতেন, তেমন না। বৃহস্পতিবার তাঁর মেয়ের জন্মদিন ছিল। মেয়ের আবদার মেনে জন্মদিন পালনের সব রকম ব্যবস্থা করেছিলেন অভিজিৎ। স্থানীয়দের দাবি, সারাদিন হই হই করে কাটালেও রাতে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তির জেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান অভিজিৎ। রাতে তিনি বাড়ি না ফেরায় তাঁর খোঁজ শুরু করেন বন্ধু বান্ধব এবং প্রতিবেশীরা। শুক্রবার সকালে মগরা থানায় যাওয়ার কথাও ছিল অভিজিতের পরিবারের। এর মধ্যেই এলাকার বাসিন্দারা অভিজিতের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে আমবাগানে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেন। খবর দেওয়া হয় মগরা থানায়।

একবিংশ শতাব্দীর ভারত দারুণ গতিতে এগিয়ে চলেছে : প্রধানমন্ত্রী

আরামবাগ, ১ মার্চ (হি.স.): একবিংশ শতাব্দীর ভারত দারুণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমরা সবাই মিলে ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। দেশের দরিদ্র, কৃষক, মহিলা এবং যুবকরা আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা দরিদ্রদের উন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়েছি এবং বিশ্ব সেই পরিনাম দেখতে পাচ্ছে।' শুক্রবার হুগলির আরামবাগের জনসভা থেকে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'গত ১০ বছরে দেশের প্রায় ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যতা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের সরকারের নির্দেশনা সঠিক, নীতি সঠিক, সিদ্ধান্ত সঠিক, এর মূল কারণ হল উদ্দেশ্যগুলি সঠিক।'প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'দেশের অন্যান্য অঞ্চলে যে গতিতে রেলের আধুনিকীকরণ হচ্ছে, আমাদের প্রচেষ্টা হল পশ্চিমবঙ্গেও সেই গতিতে রেলের আধুনিকীকরণ ঘটানো।' প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, 'পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কীভাবে উন্নয়ন করা যায় তা ভারত বিশ্বকে দেখিয়েছে।' তিনি বলেছেন, 'আজ এখানে ৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে রেল, বন্দর, পেট্রোল ও জলশক্তি। আমরা পশ্চিমবঙ্গের রেলওয়ের পরিকাঠামোকে একই গতিতে আধুনিকীকরণ করার জন্য মুখিয়ে আছি, যেভাবে দেশের অন্যান্য অংশে বিদ্যমান।'প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণার ভূমি। দাসত্বের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেওয়া প্রত্যেক মহান ব্যক্তির স্বপ্ন ছিল ভারত উন্নয়নের নতুন উচ্চতা অর্জন করুক এবং আমি বলতে পারি যে বর্তমান ভারত তাঁদের সেই স্বপ্নই পূরণ করছে।'

ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই অলরাউন্ডারের ৪৭-তম জন্মদিন আজ

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : পাকিস্তানের শহীদ আফ্রিদি। একজন দুর্দান্ত অলরাউন্ডার। যেমন বিধ্বংসী ব্যাটিং তেমনই দুর্দান্ত বোলিংও করতেন। আর এজন্য পুরো বিশ্বে তিনি খুবই জনপ্রিয়। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই অলরাউন্ডার ২০১৮ সালে অবসর নিয়েছেন। শুক্রবার, ১ মার্চ ৪৭-তম জন্মদিন তাঁর। বিধ্বংসী ব্যাটিং দেখিয়ে মাত্র ১৬ বছর বয়সে ওয়ানডেতে মাত্র ৩৭ বলে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নিজের আগমন বার্তা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

ক্যারিয়ারে বিশাল বিশাল ছক্কা হাঁকানোর জন্য আফ্রিদি সবার কাছে 'বুমবুম' নামেও পরিচিত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রেকর্ড ৪৭৬টি ছক্কা হাঁকানোর কীর্তিও আছে তাঁর। এছাড়া বল হাতে তাঁর ঘূর্ণিতে কুপোকাত হয়েছেন অনেক বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যান। ক্যারিয়ারে ৩৯৮টি ওয়ানডে ম্যাচে ৮০৬৪ রান আর ৩৯৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি রয়েছে আফ্রিদির। পাকিস্তানের হয়ে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে ৫২৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার রেকর্ডও আছে তার নামে।

স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার প্রতিবাদে সরব শিক্ষক সংগঠন

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : শুক্রবারই রাজ্যে আসছে ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।ভোটের জন্য কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় একাধিক স্কুল কেন্দ্রীয় বাহিনীর দখলে চলে যাওয়ায় পড়াশোনা শিকেয় উঠবে।

তাই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে অন্যত্র রাখার দাবিতে সরব হয়েছে শিক্ষক সংগঠন।

প্রতিবাদে সরব হয়েছে শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, দেড় দু'মাস ধরে চলবে লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া। কেন্দ্রীয় বাহিনীর দখলে স্কুল থাকলে আদতে পড়াশোনা শিকেয় উঠবে।

তাই স্কুলের পরিবর্তে জেলায় জেলায় থাকা অডিটোরিয়ামে বাহিনীকে রাখার ব্যবস্থা করা হোক। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে সংগঠনের তরফে জানানোও হয়েছে। একই মত শিক্ষক, শিক্ষিকাদের সিংহভাগের। তাঁদের অনেকেরই মতে, অতীতে কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে যাওয়ার পর দেখা গিয়েছে স্কুলের বেঞ্চ সহ পরিকাঠামোর বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অথচ আজও সেই ক্ষতিপূরণ মেলেনি।

লোকসভা ভোটকে কেন্দ্র করেই বাহিনীর আগমন। ভোটের আগে আরও বাহিনী আসবে। সেজন্য এখন থেকেই একাধিক স্কুল চিহ্নিত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার ব্যবস্থার জন্য ইতিমধ্যে বেথুন স্কুল, আনন্দপুর হাইস্কুল ক্লাস কাটছাঁটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রিমিয়ার লিগে ফেব্রুয়ারি মাসে ভাঙল গোলের রেকর্ড

ম্যানচেস্টার, ১ মার্চ (হি.স.) : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লিওনেল মেসি-ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো গত দুই দশক ধরে বিরতিহীনভাবে গোল করে যে রেকর্ড করে গেছেন সেই ধারাকে এখন ধরে রেখেছেন আর্লিং হলান্ড-কিলিয়ান এমবাপ্পেরা। এর ফলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে হচ্ছে নতুন নতুন সব গোলের রেকর্ডও। প্রিমিয়ার লিগে এই সেদিন ফেলে আসা ফেব্রুয়ারি মাসে যেমন হয়েছে ম্যাচপ্রতি গোল করার নতুন এক রেকর্ড।

যেমন ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট হাম-ব্রেন্টফোর্ট ম্যাচে দেখা মিলেছে ৬ গোল। এরফলে ফেব্রুয়ারি মাসে সব ম্যাচ মিলিয়ে হয়েছে ৪২ ম্যাচে ১৫৮ গোল। যেখানে ম্যাচ প্রতি গোল ছিল ৩.৮টি। এর আগে কখনই প্রিমিয়ার লিগে নির্দিষ্ট কোন মাসে এই হারে গোল হয়নি। ফেব্রুয়ারি মাসে গোলের এই রেকর্ড হওয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। ২০২৩-২৪ মরসুমে এখন পর্যন্ত ম্যাচ প্রতি গোল হয়েছে ৩.২৫টি। যা প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এর আগে ম্যাচ প্রতি গোলের সর্বোচ্চ হার ছিল ২.৮৫।

"আসছেন যখন, বলে যান", বকেয়া নিয়ে মোদীকে তোপ তৃণমূল নেতৃত্বের

কলকাতা, ১ মার্চ, (হি.স.): 'আয়ে হো তো বতা কে যাও'। এই হ্যাশট্যাগের উপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বঙ্গ সফরের আগে ময়দানে নেমেছে তৃণমূল। সৌজন্যে সমাজমাধ্যম। ওই হ্যাশট্যাগ ধরে সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে মূলত দু'টি প্রশ্ন করতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল। দু'টিই ভিন্ন বিষয়ে।

মোদীর উদ্দেশে তৃণমূলের প্রথম প্রশ্ন, "আমাদের ১০০ দিনের শ্রমিকদের 'মন কি বাত' আপনি কবে শুনবেন? আপনার সরকার তো ওই খাতে বরাদ্দ টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বাংলার সমস্ত বঞ্চিত শ্রমিকদের ১০০ দিনের কাজের টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে।" অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মহুয়া মৈত্র, শশী পাঁজাআনেকেরই এক্স হ্যান্ডেলে শুক্রবার দেখা যাচ্ছে এই বকেয়া প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রশ্নটি রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে নিয়ে। মোদীর উদ্দেশে তৃণমূলের প্রশ্ন, "সিবিআইয়ের এফআইআরে নাম থাকা শুভেন্দু অধিকারীকে কি আপনি দল থেকে বহিষ্কার করবেন? না কি ওঁর সঙ্গেই এক মঞ্চে থেকে দুর্নীতিগ্রস্তদের আশ্রয় দেওয়ার 'মোদী কি গ্যারান্টি' প্রমাণ করবেন আরও এক বার?"

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের আগে ১০০ দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যকে বঞ্চনার অভিযোগকেই বাংলায় বিজেপির বিরুদ্ধে মূল হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। এই সঙ্গে তৃণমূলের সবচেয়ে বেশি রাগ রাজ্য বিজেপি-র সবচেয়ে আগ্রাসী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর ওপর।

খেলতে গিয়ে বিপত্তি, নামখানায় আইসিডিএস সেন্টারে গরম খিচুড়ির কড়াইয়ে পড়ে গেল শিশু

কাকদ্বীপ, ১ মার্চ (হি.স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানার মৌসুনির বাগডাঙার আইসিডিএস সেন্টারে মিড-ডে মিলের গরম খিচুড়ির কড়াইয়ে পড়ে গেল ৫ বছরের এক শিশু । শুক্রবার সকালের ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় শিশুকে হাসপাতালে ভরতি করানো হয়েছে । জানা গিয়েছে, খেলতে খেলতে গরম কড়াইয়ের কাছে চলে যায় বাচ্চাটি । তখনই অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে রান্নার কড়াইয়ে পড়ে যায় সে । স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন সকালে রান্নার পর বাচ্চাদের মিড-ডে মিলের খাবার বিতরণের প্রস্তুতি চলছিল । সেই সময় রান্নার কড়াইতে গরম খিচুড়ি রাখা ছিল । সেই সময় বাচ্চারা অন্য জায়গায় খেলছিল ।

রান্নার পর আইসিডিএস কর্মী বাচ্চাদের জন্য জল আনতে বাইরে যান । সেই সময়ই কয়েকজন বাচ্চা খেলতে খেলতে রান্নার জায়গায় চলে আসে । আর নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতে ৫ বছরের এক বাচ্চা গরম খিচুড়ির কড়াইয়ে পড়ে যায় । সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুরু করে দেয় সে ।

সেই চিৎকার শুনে রান্নার জায়গায় যান আইসিডিএস কর্মী এবং শিক্ষিকারা । দ্রুত তাকে কড়াই থেকে তুলে স্থানীয় কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয়দের সাহায্যে । সেখানেই বাচ্চাটি বর্তমানে ভরতি রয়েছে । তার আগেই অবশ্য বাচ্চাটির অভিভাবকরা হাসপাতালে পৌঁছে যান ।

সন্দেশখালির বোনেদের সঙ্গে তৃণমূল যা করেছে, তা দেখে গোটা দেশ ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত : প্রধানমন্ত্রী

আরামবাগ, ১ মার্চ (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির ঘটনার জন্য এবার তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী শুক্রবার হুগলির আরামবাগে বিজয় সংকল্প জনসভাকে সম্বোধন করেন। এই জনসভায় বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'গত ১০ বছরে ভারত আর্থিকভাবে শক্তিশালী হয়েছে। আমরা সবাই দেখেছি, জি-২০-তে ভারত কীভাবে উল্লসিত হয়েছিল। এখন ভারত মহাকাশ সেক্টরে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠছে।

বিশ্বের অন্য কোনও দেশ যা করতে পারেনি তা আমাদের চন্দ্রযান করেছিল। এখন ভারত ক্রীড়া ক্ষেত্রেও নতুন রেকর্ড গড়ছে। আমরা সকলেই ভাগ্যবান যে, ভগবান শ্রী রাম এখন নিজের বিশাল মন্দিরে বিরাজমান।'

এর পরই তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'দেশের এ সব প্রাপ্তির মধ্যেই এখন বাংলার অবস্থা দেখছে গোটা দেশ।

মা, মাটি, মানুষের যাঁরা জয়জয়কার করত, সেই টিএমসি (তৃণমূল কংগ্রেস) সন্দেশখালির বোনেদের সঙ্গে যা করেছে, তা দেখে গোটা দেশ ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'তৃণমূলের নেতা সন্দেশখালিতে মা-বোনেদের সঙ্গে দুঃসাহসের সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। সন্দেশখালির বোনেরা যখন নিজেদের আওয়াজ তুলেছিল, মমতা দিদির কাছে সাহায্য চেয়েছিল, বিনিময়ে বাংলা সরকার টিএমসি নেতাকে বাঁচাতে সমস্ত শক্তি ব্যবহার করেছিল। কিন্তু বিজেপির চাপে অবশেষে গতকাল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে বাংলা পুলিশ।'

তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস এবং আইএনডিআই জোটের কাজ হল দুর্নীতিগ্রস্ত, পরিবারবাদী এবং তোষণকারীদের সমর্থন করা, এটাই তাঁদের একমাত্র কাজ, এটাই তাঁদের সবচেয়ে বড় কাজ। বাংলায় অপরাধ ও দুর্নীতির নতুন মডেল তৈরি করেছে টিএমসি।'

করনদিঘিতে জাল নোট সহ ধৃত মহিলা

করনদিঘি, ১ মার্চ (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরের করনদিঘিতে প্রচুর সংখ্যক জাল নোট সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক মহিলা। শুক্রবার গোয়ালপোখর থানার পুলিশ মহিলাকে পাকড়াও করে একটি সরকারি বাস থেকে।

জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলার বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার করনদিঘি এলাকায়। গোপনসূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ পাঞ্জিপাড়া এলাকায় একটি সরকারি বাস থামিয়ে তল্লাশি চালায়। সেই সময়ই সেই বাস থেকে এক মহিলার হেপাজত থেকে উদ্ধার হয় ১৯৮টি ৫০০ টাকার জাল নোট। এরপরই মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। ধৃত মহিলা কোথা থেকে এই বিপুল পরিমান জাল টাকা পেল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিন মহিলাকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ৭ দিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

ঝাড়খণ্ডের দ্রুত উন্নয়নের জন্য সুশৃঙ্খল আইনশৃঙ্খলা থাকা প্রয়োজন : প্রধানমন্ত্রী

ধানবাদ, ১ মার্চ (হি.স.) : কংগ্রেস ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, 'ঝাড়খণ্ডে দ্রুত উন্নয়নের জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল হওয়া প্রয়োজন এবং প্রশাসনকে সৎ হতে হবে। কিন্তু যখন থেকে এখানে জেএমএম এবং কংগ্রেসের পরিবারতান্ত্রিক, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং তোষণের সরকার গঠিত হয়েছে, পরিস্থিতি বদলেছে। জেএমএম মানে জমিয়ে খাও।

শুক্রবার ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই জনসভায় মোদী বলেছেন, 'বিজেপির উদ্দেশ্য হল-বিকাশ, বৃদ্ধি এবং দ্রুত বৃদ্ধি। অন্যদিকে, কংগ্রেস অথবা তাঁদের সহযোগীরা উন্নয়নের সবচেয়ে বড় শত্রু।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'জেএমএম এবং কংগ্রেস জনজাতীয়দের শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে বিবেচনা করেছে। এখানকার প্রতিভাশালী যুবকদের এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে না তাঁরা, কারণ পরিবারবাদীরা শুধুমাত্র নিজের পরিবারের কথাই ভাবে। কিন্তু মোদী আপনাদের কথা ভাবে, আপনাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে। তোমার আমার পরিবার, তোমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ আমার গ্যারান্টি।'

পঞ্জাবের কৃষকরা ৩ মার্চ পর্যন্ত দিল্লিতে নিজেদের পদযাত্রা স্থগিত করেছে

চন্ডিগড়, ১ মার্চ (হি.স.) : হরিয়ানার সীমান্তে আন্দোলনরত পঞ্জাবের কৃষকরা ৩ মার্চ পর্যন্ত দিল্লিতে নিজেদের পদযাত্রা স্থগিত করেছে। কৃষক শুভকরণের জন্য অন্তিম প্রার্থনা জানানো সমাপ্ত হওয়ার পরই কৃষকদের পদযাত্রা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। শুক্রবার কৃষক নেতা সারওয়ান পান্ধের এবং জগজিৎ ডালেওয়াল এই তথ্য জানিয়েছেন।

এদিন কৃষক নেতা সারওয়ান পান্ধের এবং জগজিৎ ডালেওয়াল জানান, শুভকরণের আত্মার শান্তির জন্য ৩ মার্চ প্রার্থনা করা হবে। তারপরেই কৃষকদের পদযাত্রা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ২৯ ফেব্রুয়ারি শুভকরণের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি জানান, ইউনাইটেড কিষান মোর্চার ৬ সদস্যের সমন্বয় কমিটি দিল্লিতে মিছিল করা ইউনাইটেড কিষান মোর্চা (অরাজনৈতিক) এবং কিষাণ মজদুর মোর্চার সঙ্গে সমন্বয় শুরু করেছে। খুব দ্রুতই আরও বড় পরিসরে আন্দোলন করা হবে বলে কৃষক নেতারা জানিয়েছেন।

এলাকা পরিদর্শনে এসে জনগণের ক্ষোভের মুখে জলপাইগুড়ির সাংসদ

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ (হি.স.) : শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পোড়াধার এলাকায় পরিদর্শনে এসে জনগণের ক্ষোভের মুখে পড়লেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডঃ জয়ন্ত রায়। শুক্রবার সকালে এলাকা পরিদর্শনে আসেন তিনি। সেখানেই সাংসদকে কাছে পেয়ে নিজেদের অভিযোগ তুলে ধরেন স্থানীয় শ্রমিকরা।

পোড়াঝাড় ও কামরাঙাগুড়ি এলাকার মাঝে মহানন্দা নদীতে একটি রেল সেতু রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই রেল সেতুর পাশে একটি সড়ক সেতু নির্মাণের দাবি রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এদিন সেই বিষয়ে এলাকা পরিদর্শনে আসেন জয়ন্ত রায়। সাংসদকে দেখামাত্রই কাজের হিসাব চাইতে শুরু করেন একশো দিনের কাজের শ্রমিকরা। ঘটনাস্থলে সাংসদ ও বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বাদানুবাদেও জড়িয়ে পড়েন অনেকে। শ্রমিকদের অভিযোগ, 'পাঁচ বছর সাংসদ থাকলেও এলাকা উন্নয়নে কোনও ভূমিকা নেননি জয়ন্ত। কেন্দ্রীয় সরকার অন্যায়ভাবে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে।' এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন বহু শ্রমিক। এনিয়ে দীর্ঘক্ষণ শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন সাংসদ। সেতু নির্মাণের বিষয়ে পদক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

'বিশ্ব শ্রবণ দিবস' উপলক্ষে 'অন্বেষা'-র কর্মসূচি

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.): ৩ মার্চ, রবিবার সারা পৃথিবী জুড়ে বিশ্ব শ্রবণ দিবস পালন করা হবে। প্রতি বছরের মতন এবছরেও বধিরতাযুক্ত শিশু ও ব্যক্তিদের মা বাবাদের সংগঠন 'অন্বেষা' কলকাতা বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। এই কর্মসূচীর অংশ হিসাবে শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে বিকেলে বিশ্ব শ্রবণ দিবসের থিম ভিত্তিক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছে অন্বেষা কলকাতা। এই সভায় উপস্থিত থাকবেন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। 'অন্বেষা' কলকাতার কো-অরডিনেটর (অ্যাওয়ারনেস, কমুনিকেশন ও অ্যাডভোকেসি) অর্ণব কুমার ভট্টাচার্য একথা জানিয়ে শুক্রবার প্রেস বিবৃতিতে লিখেছেন, "কানে কম শোনা বা বধিরতা - একটি ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বধিরতা প্রতিরোধ, কানের ও শোনার যত্নের উপর জোর দিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে বরাবরের মতন এবছরেও সারা পৃথিবী জুড়ে মার্চ মাসের ৩ তারিখে বিশ্ব শ্রবণ দিবস পালন করা হবে।

লালুর আরজেডি-তে ভাঙন, বিজেপিতে যোগ দিলেন ভরত বিন্দ

পাটনা, ১ মার্চ (হি.স.) : ভাঙন ধরল লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এ। শুক্রবার আরজেডি-র সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বিহারের ভাবুয়া বিধানসভা আসনের বিধায়ক ভরত বিন্দ। পাটনায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ভরত বিন্দ।

বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণ, আতঙ্কে ছোটাছুটি

বেঙ্গালুরু, ১ মার্চ (হি.স.) : বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ডের রামেশ্বরম ক্যাফে। শুক্রবার দুপুরে এই ক্যাফেতে বিস্ফোরণ হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এই বিস্ফোরণ হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। হতাহতের খবর পাওয়া গিয়েছে। বিস্ফোরণের পরই আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে দেন উপস্থিত মানুষজন। পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, 'আমাদের ফোন করে জানানো হয়, বেঙ্গালুরুর হোয়াইটফিল্ডের রামেশ্বরম ক্যাফেতে একটি সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটেছে। আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি এবং আমরা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছি।' বিস্ফোরণের খবর পেয়ে পরে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশও।

কাজের সন্ধান

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাঙ্কে চাকরির লক্ষ্যে ৩০০০ এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, ১০ মার্চে, তবে কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিশেষ করে সি.বি অফ আই-এ এখন এপ্রেন্টিস হিসেবে ৩০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোটকথা, ব্যাঙ্কে চাকরির জন্যও এখন থেকে এপ্রেন্টিস হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ট্রেনিং প্রাপ্ত হতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৬-০৩-২০২৪-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন রাজ্য ভিত্তিক,ক্যাটেগরি অনুযায়ী বিস্তারিত দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগ হবে এপ্রেন্টিস অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুযায়ী ফিনান্সিয়াল ইয়ার ২০২৪-২৫ অনুসারে। ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — মোট শূন্যপদ ৩০০০-এর মধ্যে এসসি ৪৫৪টি, এসটি ২৪৬টি, ওবিসি ৬৯৪টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৯৭টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১১৯২টি পদ রয়েছে জেনারেল প্রার্থীর জন্য। সামগ্রিক হিসেবে ১১৭টি পদ রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য। এছাড়াও, রাজ্য এবং রিজিওন অনুযায়ী পদের বিভাজন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে। এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রশিক্ষণ কাল সকল ক্ষেত্রেই ১ বছর রাখা হয়েছে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ৬ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ৬ মার্চ। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট (যা যা প্রয়োজন) ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। চালানের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমার পদ্ধতিতে না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। ইন্টারভিউর বা সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল ই-পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি কোথাও পাঠাতে হবে না, নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি রিজিওন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক অঞ্চলের জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক রাজ্যের জন্যও আবেদন করা যাবে না। উচ্চতর বা অধিকতর পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন তবে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সেগুলো বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ব্রাঞ্চসমূহের অবস্থান অনুযায়ী প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। যেমন রুরাল বা সেমি আরবান ব্রাঞ্চ, আরবান ব্রাঞ্চ ও মেট্রো ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ১৫,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন করার কৌশল পেয়ে যাবেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে অথবা এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ।

টি পি এস সি-র পরীক্ষায় যোগ্যতা সংযোজন শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। যোগ্যতায় বেহ কিছু সংযোজন আনা হয়েছে। একই সঙ্গে অনলাইনে দরখাস্তের শেষতারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের সুবিধার্থে এখানে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুনরায় প্রকাশিত হলো। ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তর এবং শিল্পবাণিজ্য দপ্তরের অধীনে সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্টপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, তবে সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স ইন কম্পিউটার অথবা 'ও' লেভেল কোর্স সার্টিফিকেট করা হতে হবে, বিসিএ/ বিএসসি (সিএস) পাশ হলেও আবেদন করা যাবে, বিএসসি (আইটি), বিই (আইটি), এমসিএ পাশ হলেও আবেদন করা যাবে বলে সংযোজন আনা হয়েছে। বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে অর্থ দপ্তরের ডাইরেক্টরেট অফ ট্রেজারিজ-এর অধীনে এস.সি.এ অর্থাৎ সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ০২/২০২৪। উপযুক্ত শিক্ষাগত ও আবশ্যক যোগ্যতা থাকলে আগামী ১২ মার্চ, ২০২৪ তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র 'অনলাইনে' দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০০ টাকা এবং তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ বা পার্সোনালিটি টেস্টের মাধ্যমে। দুই ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। এছাড়া অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা দরখাস্তের বয়ান, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে।

শূণ্যপদগুলো হল — আইটেম নং - ০১ ঃ পদের নাম - সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ শূন্যপদ ২৩টি। এর মধ্যে ১২টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ৪টিপদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ৭টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তফশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত ৪টি পদের মধ্যে ২টি পদ এবং তফশিলি উপজাতিভুক্ত ৭টি পদের মধ্যে ২টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অসংরক্ষিত ১২টি পদের মধ্যেও ৪টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ১টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পদগুলো পার্মানেন্ট। আইটেম নং - ০২ ঃ পদের নাম - সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ শূন্যপদ ১০টি। এর মধ্যে ৪টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ২টিপদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ৪টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তফশিলি উপজাতিভুক্ত ৪টি পদের মধ্যে ২টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অসংরক্ষিত ১২টি পদের মধ্যেও ৪টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পদগুলো টেম্পোরারি বা অস্থায়ী। উল্লেখ্য, পদগুলো গ্রুপ-সি, নন-গ্যাজেটেড এবং রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের ডাইরেক্টরেট অফ ট্রেসারিজ এবং শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরে আই-টি শাখার জন্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, তবে সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স ইন কম্পিউটার অথবা 'ও' লেভেল কোর্স সার্টিফিকেট করা হতে হবে, বিসিএ/ বিএসসি (সিএস) পাশ হলেও আবেদন করা যাবে। বিএসসি (আইটি), বিই (আইটি), এমসিএ পাশ হলেও আবেদন করা যাবে বলে সংযোজন আনা হয়েছে। এছাড়াও, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। বয়স ঃ উভয় ক্ষেত্রে ২৬-০২-২০২৪ তারিখের হিসেবে ২১ থেকে ৪০ বছর। এছাড়া, এস সি/ এস টি / শারীরিক প্রতিবন্ধী/ সরকারি চাকুরিরত প্রার্থীরা বয়সের উর্ধ্বসীমায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় পাবেন। উল্লেখ্য, সংরক্ষণ ও বয়সের শিথিলতা শুধুমাত্র ত্রিপুরায় বসবাসকারী তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য। প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে ৮৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং পরে ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার ভিত্তিতে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন। সামগ্রিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। ৮৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৮৫টি প্রশ্ন। প্রথম ২০টি প্রশ্নের বিষয় - ইংরেজি, পরবর্তী ২০টি প্রশ্নের বিষয় জিকে এন্ড কারেন্ট এফেয়ার্স, এবং শেষ ৪৫টি প্রশ্নের বিষয় জব-ওরিয়েন্টেড। সিলেবাস সংক্রান্ত বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতেও তা জেনে নিতে পারেন। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে অথবা অনলাইনে এদেঁর ওয়েবসাইটে, ইমেলে বা কল লেটারে জানানো হবে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট ক্যাডার অফিসার, ম্যানেজার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি, বিই, বিটেক, এমবিএ, পিজি, সিএ পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিভিল সার্ভিস** (ইউপিএসসি)
শূন্যপদ ঃ ১০৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৬ মে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস** (ইউপিএসসি)
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৬ মে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সেলস এক্সিকিউটিভ, ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার (রাজ্যে এবং বহিঃরাজ্যে প্রাইভেট সেক্টর),**
আগরতলায় 'রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ'-এর মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
আগরতলায় নির্দিষ্ট স্থানে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ, লিখিত পরীক্ষা বা সরাসরি ইন্টারভিউ ৫ ও ৬ মার্চ।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩০০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১০ মার্চে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ডি.আর.ডি.ও),**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ম্যানেজার (এনটিপিসি),**
শূন্যপদ ঃ ১১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এসএসসি অফিসার (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ২৫৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (নাবার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৩১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি, সিএ পাশ,
বয়স ঃ ২৭-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ওয়ার্কার (অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ১৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, তবে সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স ইন কম্পিউটার অথবা 'ও' লেভেল কোর্স সার্টিফিকেট করা হতে হবে, বিসিএ/ বিএসসি (সিএস)/ বিএসসি (আইটি)/ বিই (আইটি) পাশ হলেও আবেদন করা যাবে,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (বিইএল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমই, এমটেকপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেকপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে),**
শূন্যপদ ঃ ২০৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬-৮ মে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৮০টি শহরে।

আগরতলায় রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ কর্পোরেট সেক্টরে ১৯১ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ , আগরতলার ব্যবস্থাপনায় দুই দিনে দুটি রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ-এর আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় বিভিন্ন কোম্পানিতে বিশেষ করে ৪টি কর্পোরেট সেক্টরে এবং বহিঃরাজ্যে দুটি সেক্টরে সেলস এক্সিকিউটিভ, ট্রেনি, অফিসার ইত্যাদি বিভিন্ন পদে লিখিত পরীক্ষা, সরাসরি ইন্টারভিউ বা 'রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ'-এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। আগরতলায় পর পর দুই দিনে দুটি পৃথক পৃথক স্থানে হবে এই 'রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ'। মোট শূন্যপদ ঃ ১৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), আগরতলায় নির্দিষ্ট স্থানে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ, লিখিত পরীক্ষা বা সরাসরি ইন্টারভিউ ৫ ও ৬ মার্চ।

বিস্তারিত খবর হলো — ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ , আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আগামী ৫ মার্চ, আগরতলাস্থিত এমবিবি কলেজ প্রাঙ্গনে বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বেসরকারি ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় কর্পোরেট সেক্টরে চাকরির জন্য 'রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ' অনুষ্ঠিত হবে। 'রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ'-এ যোগদানের জন্য চাকুরি প্রত্যাশীরা সরাসরি ইন্টারভিউতে সামিল হবেন, বায়োডেটার সঙ্গে সমস্ত অরিজিনাল ডকুমেন্টস নিয়ে। বলা বাহুল্য, এই জব ফেয়ার বা সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য আগের থেকে কোনও আবেদনপত্র জমা করতে হবে না।

ইচ্ছুক প্রার্থীরা নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ৫ মার্চ, এমবিবি কলেজ প্রাঙ্গনে সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সরাসরি ইন্টারভিউতে অংশ নিতে পারেন। ইন্টারভিউর সময় প্রার্থীদের জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, নাগরিকতার সার্টিফিকেট বা পি. আর.টি.সি., এন.সি.এস. কার্ড, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ডকুমেন্ট, ফটোকপি সহ, দুই কপি সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের কালার ফটো সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে। মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা থেকেও বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন। যেসব প্রার্থী নির্বাচিত হবেন, তাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা তাঁদের বেতন, কাজ ও অন্যান্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা থেকে নিশ্চিতভাবে জানার পর যেন কাজে যোগদান করেন। ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রজেক্টের আওতায় মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা, এমপ্লয়ার ও কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য এই আয়োজন করছে। এমপ্লয়ার বা কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে যে-কোনও কেউ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা দায়ি থাকবে না। অনলাইনে, অফলাইনে বা ডাকযোগে কোনওভাবেই আগে থেকে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। সরাসরি বা ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রও জেরক্স সহ অরিজিনাল সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে একটি বায়োডেটা বা সিভি সঙ্গে রাখবেন। এছাড়া, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানো এমন কি প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে 'রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ'-এ শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃ নিয়োগ হবে সাটিন ক্রেডিট কেয়ার নেটওয়ার্ক লিমিটেড-এর অধীনে। পদের নাম ট্রেনি কমিউনিটি সার্ভিস অফিসার। শূন্যপদ ১০টি। মূল মাইনে ১৪,৯৬২ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ। বয়স অনূর্ধ্ব ২৪ বছর। এছাড়া, পদের নাম কমিউনিটি সার্ভিস অফিসার এন্ড সিনিয়র কমিউনিটি সার্ভিস অফিসার। শূন্যপদ ১০টি। মূল মাইনে প্রতি মাসে ১৫৪৪২-১৮০২৭ টাকা। যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ। বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ বছর। ক্রমিক নং (২) ঃ নিয়োগ হবে প্রান বেভারেজ (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড -এর অধীনে। পদের নাম টেলি সেলস্ এক্সিকিউটিভ। শূন্যপদ ৫০টি। মূল মাইনে ১০,০০০ - ১৫,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক/ গ্র্যাজুয়েট (মহিলা)। বয়স অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। এছাড়া, পদের নাম সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ। শূন্যপদ ৩০টি। মূল মাইনে ১০,০০০ - ১৫,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক/ গ্র্যাজুয়েট (মহিলা)। বয়স অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। পদের নাম ইলেকট্রিশিয়ান। শূন্যপদ ২টি। মূল মাইনে ৮,০০০ - ১২,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা মাধ্যমিক ও আইটিআই পাশ। বয়স অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। পদের নাম সুপারভাইজর। শূন্যপদ ২টি। মূল মাইনে ৮,০০০ - ১০,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট পাশ। বয়স অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।

ক্রমিক নং (৩) ঃ নিয়োগ হবে শ্রীরাম লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড-এর অধীনে। পদের নাম সেলস্ এক্সিকিউটিভ। শূন্যপদ ১০টি। মূল মাইনে ১২,০০০ - ১৫,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট। বয়স ১৮-৪০ বছর। এছাড়া, পদের নাম ওপিসি বা সেলস এক্সিকিউটিভ । শূন্যপদ ১০টি। মূল মাইনে ১২,০০০ - ১৩,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা ৮ম শ্রেনি পাশ থেকে গ্র্যাজুয়েট। বয়স ১৮-৪০ বছর।

ক্রমিক নং (৪) ঃ নিয়োগ হবে অন্নপূর্ণা ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর অধীনে। পদের নাম ফিল্ড ক্রেডিট অফিসার। শূন্যপদ ১০টি। মূল মাইনে ১২,৫০০ টাকা প্রতি মাসে। সঙ্গে ইনসেনটিভ। যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট। বয়স ১৯-২৮ বছর। এছাড়া, পদের নাম ইন্টারনেল অডিট । শূন্যপদ ২টি। মূল মাইনে ১৪,০০০ টাকা প্রতি মাসে। সঙ্গে ডিএ এবং ইনসেনটিভ। যোগ্যতা বিকম পাশ। বয়স ১৯-২৮ বছর।

একইভাবে আগামী ৬ মার্চ, নরসিংগড়ে টিআইটি-তে বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বহিঃরাজ্যের বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্পোরেট সেক্টরে চাকরির জন্য 'রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ' অনুষ্ঠিত হবে। নিয়োগ হবে বাওয়াল-এর অধীনে। পদের নাম ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি। শূন্যপদ ৩০টি। মূল মাইনে ১৫,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেকট্রনিক্স/ ইলেকট্রিক্যাল) পাশ। বয়স ১৮-২৫ বছর। এছাড়া, নিয়োগ হবে প্যান ইন্ডিয়ার অধীনে। পদের নাম গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি। শূন্যপদ ২৫টি। মূল মাইনে ২২,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা বিটেক (মেকানিক্যাল/ প্রোডাকশন) ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ। বয়স ১৮-২৫ বছর। তবে এবিষয়ে আরও বিস্তারিত এঁদের বিজ্ঞপ্তি দেকে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কীপরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **স্পেশালিস্ট ক্যাডার অফিসার, ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি, বিই, বিটেক, এমবিএ, পিজি, সিএ পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস** ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে) , অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৬ মে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস** শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি/ বিই ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য) , বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৬ মে।

* রাজ্যে এবং বহিঃরাজ্যে প্রাইভেট সেক্টরে **সেলস এক্সিকিউটিভ, ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি ইন্টারভিউ বা লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগরতলায় 'রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ'-এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। শূন্যপদ ঃ ১৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), আগরতলায় নির্দিষ্ট স্থানে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ, লিখিত পরীক্ষা বা সরাসরি ইন্টারভিউ ৫ ও ৬ মার্চ।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১০ মার্চে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

* ডি.আর.ডি.ও-তে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* এনটিপিসি-তে **ডেপুটি ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* ভারতীয় নৌবাহিনীতে **এসএসসি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * নাবার্ড-এ **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি, সিএ পাশ, বয়স ঃ ২৭-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে **ওয়ার্কার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় দুটি দপ্তরে **সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, তবে সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স ইন কম্পিউটার অথবা 'ও' লেভেল কোর্স সার্টিফিকেট করা হতে হবে, বিসিএ/ বিএসসি (সিএস) / বিএসসি (আইটি)/ বিই (আইটি) পাশ হলেও আবেদন করা যাবে, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রক বি.ই.এল-এ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমই, এমটেকপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মার্চ, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬-৮ মে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে ৮০টি শহরে।

সপ্তাহান্তে বাতিল বেশ কিছু ট্রেন

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : দমদমে নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য সপ্তাহান্তে শিয়ালদহ শাখায় বাতিল একাধিক ট্রেন। শিয়ালদহ বনগাঁ, শিয়ালদহ বসিরহাট ও শিয়ালদহ মেইন শাখায় বাতিল বহু লোকাল। যার জেরে প্রবল ভোগান্তির আশঙ্কায় আমজনতা।

রেল সূত্রে খবর, একাধিক ট্রেনের গতিপথ বদল করা হয়েছে। জেনে নিন দুদিনে বাতিল কোন শাখার কটি ট্রেন। ২ তারিখ বাতিল থাকবে

শিয়ালদহ-রানাঘাট- ২ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-হাবড়া- ১২ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-হাসনাবাদ- ৫ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-ডানকুনি- ২৬ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-মধ্যমগ্রাম-২ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-দমদম ক্যান্ট- ২ (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-বারাসত- ৬ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-গোবরডাঙা- ৬টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-দত্তপুকুর- ১৭ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-বারাকপুর- ৩১ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-নৈহাটি- ৪২টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-বর্ধমান-২ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-কাটোয়া-২ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-বজবজ- ৩টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-ঠাকুরনগর- ২ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-বনগাঁ- ২ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
বারাসত-হাসনাবাদ- ১ টি (আপ)
দমদম-বারাকপুর-১ টি (আপ)
হাসনাবাদ-দমদম-১ টি (ডাউন)

৩ তারিখ বাতিল থাকবে

শিয়ালদহ-রানাঘাট- ৬ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-হাবড়া- ৮ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-হাসনাবাদ- ৪ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-ডানকুনি-২৪ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-গোবরডাঙা- ৬ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-দত্তপুকুর- ১৩ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-বারাকপুর -২০ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)
শিয়ালদহ-নৈহাটি- ৩০ টি (আপ-ডাউন মিলিয়ে)

এছাড়াও বাতিল বেশ কয়েকটি এক্সপ্রেস ও মেনু প্যাসেঞ্জার। যার জেরে রাস্তায় বেরিয়ে প্রবল সমস্যায় পড়ার আশঙ্কায় আমজনতা।

ভারত বিশ্বে নারী ক্ষমতায়নের আদর্শ হয়ে উঠেছে : রাষ্ট্রপতি

ভুবনেশ্বর, ১ মার্চ (হি.স.) : ভারত বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নের আদর্শ হয়ে উঠেছে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, দেশের নারীরা প্রমাণ করেছেন, সুযোগ পেলে সব ক্ষেত্রেই তাঁরা পুরুষদের ছাড়িয়ে যেতে পারেন। রাষ্ট্রপতি শুক্রবার ওড়িশার গঞ্জাম জেলার ভঞ্জ বিহারে বেরহামপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'ভারত নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনীর স্থায়ী কমিশনে এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছে যা একসময় পুরুষদের একচেটিয়া ছিল।' তিনি বলেন, 'ভারত শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে একটি উন্নত দেশ হবে।'

কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনায় ব্যাঘাতের আশঙ্কা

কলকাতা, ১ মার্চ, (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের দিন এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তার আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে শুরু করেছে। জওয়ানদের থাকার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি স্কুলে। যার ফলে পঠনপাঠনে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে। পড়াশোনায় ব্যাঘাতের আশঙ্কা দেখা দেবে।

শুক্রবারই রাজ্যে চলে আসার কথা ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর। সেই বেশ কিছু স্কুলে আচমকা বন্ধ করে দিতে হয়েছে ক্লাস। এ বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে কিছু জানানোই হয়নি বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে উত্তর কলকাতার বেথুন স্কুলকে। ওই স্কুলে স্থানীয় থানা থেকে নোটিস গিয়েছে বলে খবর। এর ফলে শুক্রবার স্কুলের সমস্ত ক্লাস বন্ধ করে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

স্কুল সূত্রে খবর, বেথুনে শুক্রবার একাদশ শ্রেণির একটি পরীক্ষা রয়েছে। স্কুলের প্রধান ভবনে যথাসময়ে পরীক্ষাটি হবে। তবে আর কোনও ক্লাস হবে না। বাকিদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু শুক্রবার নয়, এখন থেকে বেথুনে পঠনপাঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়ে গিয়েছে। কারণ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা স্কুলে থাকলে স্বাভাবিক পঠনপাঠন সম্ভব হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে কবে থেকে, কী ভাবে ক্লাস হবে, তা পরবর্তী কালে স্কুলের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে ছাত্রীদের।সূত্রের খবর, শুধু বেথুন নয়, রাজ্য সরকারি একাধিক স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে বলে চিঠি গিয়েছে থানা থেকে। তালিকায় রয়েছে যাদবপুরের তিনটি স্কুল, উত্তরপাড়ার একটি স্কুল। এ ছাড়া রাজ্যের অন্যত্রও বিভিন্ন স্কুলে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গে পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, তিনি বিষয়টি শুনেছেন। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও পক্ষ তাঁকে কিছু জানায়নি। অর্থাৎ, ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার জন্য যে বেশ কয়েকটি সরকারি স্কুলকে ব্যবহার করা হচ্ছে, পর্ষদ সে সম্পর্কে অবহিত নয়। প্রশাসন বা স্কুলের তরফে পর্ষদকে বিষয়টি জানানো হয়নি।

পর্ষদ সভাপতি বলেন, "আমি বিষয়টি শুনেছি। মার্চের প্রথম দিন থেকেই যদি এ ভাবে সরকারি স্কুল নিয়ে নেওয়া হয়, পঠনপাঠনের সমস্যা হবে। সামনে বিভিন্ন পরীক্ষা রয়েছে। পঠনপাঠনের বিকল্প ব্যবস্থা কী হবে, আমার সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়নি।"

শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগারসহ গ্রেফতার চার

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ (হি.স.) : স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ও বাগডোগরা থানার পুলিশ চার মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শিলিগুড়ির এশিয়ান হাইওয়ে থেকে চোরাকারবারিদের আটক করা হয়। ধৃত পাচারকারীদের নাম হল জহিরুদ্দিন, মহম্মদ মঞ্জুর, রাজেশ সিং এবং দীপেন সিং।

সূত্রের খবর, বিধাননগরের বাসিন্দা জহিরুদ্দিন এবং মহম্মদ মঞ্জুর আলম বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চোপড়ার রাজেশ সিং এবং দীপেন সিংকে ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সরবরাহ করতে বাগডোগরা এশিয়ান হাইওয়েতে পৌঁছেছিলেন। এসওজি ও বাগডোগরা থানার পুলিশ এ বিষয়ে গোপন খবর পায়।

এরপর অভিযান চালিয়ে চার মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। আসামিদের কাছ থেকে ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ একটি বাইক ও তিনটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

হরিদেবপুরে কুয়ো থেকে উদ্ধার প্রৌঢ়ার দেহ, গ্রেফতার স্বামী-ছেলে-বৌমা

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : হরিদেবপুরের কৈলাস ঘোষ রোডে এক প্রৌঢ়ার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে উমা দাস (৫২) নামে ওই প্রৌঢ়ার দেহ উদ্ধার হয় বাড়ির কুয়ো থেকে ।

স্থানীয় এবং পরিবারের একাংশের অভিযোগ সম্পত্তির জন্য উমা দাসকে খুন করা হয়েছে । ঘটনায় মহিলার স্বামী, ছেলে এবং বৌমাকে গ্রেফতার করেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ। গতকাল রাতে পুলিশ দেহ উদ্ধার করতে গেলে, বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

পুলিশ সূত্রে খবর, উমা দাসের নামে থাকা সম্পত্তি লিখিয়ে নেওয়ার জন্য বহুদিন ধরে তাঁর উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এমনকি তাঁর উপর অত্যাচারও করতেন মৃতের স্বামী নরেশ দাস, ছেলে অমিত দাস এবং বৌমা মধুমিতা দাস। অভিযোগ সম্প্রতি সেই অত্যাচারের মাত্রা চরমে ওঠে ।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, গতকাল রাত ৯টা নাগাদ বাড়ির পিছনে থাকা কুয়োতে উমা দাসের দেহ ভেসে ওঠে। পরিবারের কোনও এক সদস্য প্রথম দেহটি দেখতে পান । এরপরেই পুলিশে খবর দেওয়া হয় ।

অভিযোগ উমা দেবীর স্বামী, ছেলে এবং বৌমা মিলে তাঁকে খুন করে কুয়োতে ফেলে দিয়েছেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই উমা দাসের বাড়ির সামনে স্থানীয়রা ভিড় করেন। বাড়ি ঘিরে শুরু হয় বিক্ষোভ। ততক্ষণে হরিদেবপুর থানার পুলিশ ও দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। কিন্তু, স্থানীয়রা দাবি করেন, আগে অভিযুক্ত তিন জনকে গ্রেফতার করতে হবে, তারপরে দেহ নিয়ে যেতে দেবে তারা। দীর্ঘক্ষণ পুলিশের সঙ্গে বচসা চলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় কাউন্সিল ও বরো কমিটির চেয়ারম্যান সুদীপ পোল্লে। তাঁকে ঘিরেও শুরু হয় বিক্ষোভ।

পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ উমা দাসের স্বামী নরেশ দাস, ছেলে অমিত দাস এবং বৌমা মধুমিতা দাসকে আটক করে নিয়ে যায়। এরপর রাত বারোটা নাগাদ দমকলের সাহায্যে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। শুক্রবার সকালে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় উমা দেবীর দেওরের মেয়ে অভিযোগ করেছেন, তিনি ওই বাড়িতে থাকতেন। তিনি অভিযোগ করেন, সেই সময়ও অভিযুক্ত তিন জন উমা দাসের উপর অত্যাচার করা হত সম্পত্তির জন্য। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মধ্যপ্রদেশের রাজগড়ে যুবকের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত ১.২৫ লক্ষেরও বেশি মূল্যের গাঁজা

রাজগড়, ১ মার্চ (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলায় এক যুবকের কাছ থেকে ১.২৫ লক্ষেরও বেশি মূল্যের গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। রাজগড় জেলার পাচোর থানার দল হাইওয়েতে টোল ট্যাক্সের কাছে ঘেরাও করে এক যুবকের থেকে গাঁজা উদ্ধার করেছে। ধৃত যুবকের বয়স ৩৫, সে বারওয়ানি জেলার বাসিন্দা। তার কাছে থাকা একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে ৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার পুলিশ এনডিপিএস আইনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে উদনখেদি গ্রামের টোল ট্যাক্সের কাছে পুলিশ ঘেরাও করে। তারপর কিষাণ (৩৫) কে আটক করে তার থেকে ৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। গাঁজার মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৮/২০ এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

কেরলের ওয়ানাড়ে ছাত্র খুনে গ্রেফতার ৬, এসএফআই-কে তোপ বেণুগোপালের

ওয়ানাড, ১ মার্চ (হি.স.) : কেরলের ওয়ানাড জেলায় ১ ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে কেরল পুলিশ। শুক্রবার কেরল পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। কেরল পুলিশ শুক্রবার জানিয়েছে যে, এক ভেটেরিনারি ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কেরল পুলিশ জানিয়েছে, ২০ বছর বয়সী জেএস সিদ্ধার্থকে ১৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর হোস্টেলের ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। সিদ্ধার্থের এক আত্মীয় বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেছিলেন, সিদ্ধার্থকে হত্যা করা হয়েছে, কোনও আত্মহত্যা সিদ্ধার্থ করেনি। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ কে.সি. বেণুগোপাল এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমরা মৃত ছাত্রের বাড়িতে গিয়ে সেখানকার মর্মান্তিক দৃশ্য দেখেছি। সিদ্ধার্থের মায়ের মুখটা চোখে দেখা যাচ্ছিল না। এই ধরনের পরিস্থিতি কথায় বর্ণনা করা যায় না।' তিনি আরও বলেন, যেভাবে এসএফআই, সিপিআই(এম)-এর অপরাধীরা কেরল রাজ্যের নির্দোষ ছাত্রদের উপর হামলা করছে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, এটা আত্মহত্যা নয়, এটা একটা স্পষ্ট খুন যা স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছে।'

ঝাড়খণ্ড পেল অনেক উপহার, একগুচ্ছ রেল প্রকল্পেরও উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী

ধানবাদ, ১ মার্চ (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডকে অনেক উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী শুক্রবার ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের এক অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যের জন্য একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। ধানবাদের সিন্দ্রিতে ৩৫,৭০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, উৎসর্গ এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদী ঝাড়খণ্ডের সিন্দ্রি সার প্ল্যান্ট দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। গোরক্ষপুর এবং রামাগুন্ডমের ফার্টিলাইজার প্ল্যান্টের পুনরুজ্জীবনের পর এটিই দেশে তৃতীয় সার প্ল্যান্ট।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মোদী ঝাড়খণ্ডে ১৭,৬০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি রেল প্রকল্পের উদ্বোধন, উৎসর্গ এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর মধ্যে রয়েছে দেওঘর — ডিব্রুগড় ট্রেন পরিষেবা, টাটানগর এবং বাদামপাহারের মধ্যে মেমু ট্রেন পরিষেবা (দৈনিক) এবং শিবপুর স্টেশন থেকে দূরপাল্লার মালবাহী ট্রেন।

শুক্রবার সকালে ধানবাদে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানান ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন। উদ্বোধন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, 'এখন রেল বিপ্লবের নতুন অধ্যায় লিখছে ঝাড়খণ্ড। এছাড়াও, হাজারিবাগ, রামগড় এবং বোকারোর এক্সপ্রেস পথগুলি ঝাড়খণ্ডের সংযোগ বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে।' মোদী বলেছেন, 'গত ১০ বছর ধরে আমরা আদিবাসী সমাজ, দরিদ্র, যুবক এবং মহিলাদের শীর্ষ অগ্রাধিকার দিয়ে ঝাড়খণ্ডের জন্য কাজ করেছি।'

অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন বলেছেন, 'ঝাড়খণ্ডকে সমৃদ্ধ করতে হবে আমাদের। সিন্দ্রিতে আমাদের সেচ সুবিধা বাড়াতে হবে, প্রধানমন্ত্রী এখানে থাকায় আজ রাজ্যের জন্য একটি বিশেষ দিন। সিন্দ্রি প্ল্যান্টের উৎপাদন রাজ্যের কৃষিক্ষেত্র এবং আমাদের কৃষকদের নানাভাবে উপকৃত করবে।'

ঢাকার বহুতলে আগুনে মৃত্যু বেড়ে ৪৬; শোকস্তব্ধ শেখ হাসিনা, অর্থ সাহায্য ঘোষণা

ঢাকা, ১ মার্চ (হি.স.): বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডের একটি বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন ৪৬ জন। অগ্নিকাণ্ডে আহত ও জখম হয়েছেন কমপক্ষে ২২ জন, এই অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় ঢামেক হাসপাতাল ও শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি আহতদের অবস্থা পরিদর্শন শেষে এই তথ্য জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে বেইলি রোডে একটি ভবনের রেস্টুরেন্টে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে, যা মোটেই কাম্য ছিল না। ওই দুর্ঘটনার পরে আমাদের এখানে (শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট) বেশ কিছু রোগী আসেন। আমাদের জানা মতে, এই ঘটনায় এ পর্যন্ত ৪৬ মারা গিয়েছেন। তিনি বলেন, যারা মারা গিয়েছেন, তাঁরা কার্বন মনোক্সাইডের বিষক্রিয়ার ফলে মারা গিয়েছেন। যখন বন্ধ ঘরে কেউ বের হতে পারেন না, তখন শ্বাসনালীতে ওই ধোঁয়া চলে যায়। প্রত্যেকেরই তা হয়েছে। যাদের বেশি হয়েছে, তারা বাঁচতে পারেননি। অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে তাদের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকার দমকল বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ ঢাকার বেইলি রোডে অবস্থিত একটি সাততলা ভবনে আগুন লাগে। বাড়িটি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হত। ওই বহুতলটিতে খাবারের দোকান ছাড়াও জামাকাপড়, মোবাইল এবং অন্যান্য দোকান ছিল। বহুতলটির দ্বিতলে একটি বিরিয়ানির দোকান ছিল। সেখানেই আগুন লাগে। মোট ১৩টি ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রায় দু'ঘণ্টার প্রচেষ্টায় রাত ১১টা ৫০মিনিট নাগাদ আগুন নেভাতে সক্ষম হন দমকল কর্মীরা। আগুন নিভিয়ে ফেলার পর শুরু হয় উদ্ধারকাজ। দমকল বিভাগের আধিকারিক মহম্মদ মইনুদ্দিন জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে প্রথম এবং দ্বিতলে সর্বপ্রথম আগুন লাগে। আগুন ক্রমে উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। নীচ থেকে উপরের দিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় বাড়িটির মধ্যেই অনেকে আটকে পড়েন। আগুন এবং ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচতে অনেকে ছাদে গিয়ে আশ্রয় নেন। বহুতলটির ভিতর থেকে মোট ৭৫ জনকে জীবিত অবস্থায় বাইরে বার করে আনা গিয়েছে। বেইলি রোডে আগুন লাগা বহুতল ভবনটির নির্মাণ ত্রুটির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সেখানে কোনও ফায়ার এক্সিট ছিল না। শুক্রবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় বীমা দিবস-২০২৪' উদযাপন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বেইলি রোডে যে আগুনটা লাগলে, সেখানে একটা বহুতল ভবন, সেখানে কোনও ফায়ার এক্সিট নেই। শেখ হাসিনা বলেন, 'এত মানুষ (৪৬ জন) মারা গিয়েছেন, এর চেয়ে কষ্টের আর কী হতে পারে?' এদিকে, বহুতল ভবনে আগুনের ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মহিববুর রহমান। শুক্রবার সকাল সোয়া ১০টায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে তিনি অনুদানের কথা ঘোষণা করেন। এই অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। বেইলি রোডে কাচ্চি ভাই নামে একটি রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সূত্রপাত জানতে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে দমকল বিভাগ। কমিটির সভাপতি হলেন- লে. কর্নেল মহম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স)। এছাড়া সদস্য সচিব মো. ছালেহ উদ্দিন, উপপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট জোনের ডিএডি, সিনিয়র স্টেশন অফিসার এবং ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর।

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে জয় ছাড়া কিছু ভাবছেন না হাবাস

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : আইএসএলে শুক্রবার মোহনবাগানের মুখোমুখি জামশেদপুর এফসি। আগের ম্যাচে ওড়িশা এফসি বিরুদ্ধে ড্র করেছে মোহনবাগান। তাই এদিনের ম্যাচে ড্রয়ের কথা ভাবছেন না সবুজ-মেরুন কোচ আন্তোনিয় লোপেজ হাবাস। তিনি শুধু জয়ের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবেন। এখনও আইএসএলে মোহনবাগানকে খেলতে হবে আরও ৭টি ম্যাচ। তাই কোনও ম্যাচ ড্র কিংবা হারতে চাইছেন না মোহন কোচ। তিনি বলেন, "জেতার কথা মাথায় রেখেই মাঠে নামব আমরা। শুধু এদিনর ম্যাচই নয় প্রতিটি ম্যাচেই আমরা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে নামবো।'

শুক্রবার ডার্বির আগে শেষ ম্যাচ মোহনবাগান খেলতে নামছে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে। তবে এখনই ডার্বি নিয়ে ভাবতে নারাজ হাবাস। তিনি বলেন, "এখনই ডার্বি নিয়ে ভাবছি না। আগে আমাদের এদিনের ম্যাচে জামশেদপুরকে নিয়ে ভাবছি। শুক্রবার একশো শতাংশ দিয়ে জয় পেতে হবে। তারপরে ডার্বি নিয়ে ভাবা যাবে।"

রাজস্থানের দিদওয়ানায় চেতক হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ, ছিলেন না কোনও ভিআইপি

জয়পুর, ১ মার্চ (হি.স.) : জয়পুরে যাওয়ার পথে রাজস্থানের দিদওয়ানায় জরুরি অবতরণ করল একটি চেতক হেলিকপ্টার। শুক্রবার সকাল ১০.৩৫ মিনিট নাগাদ দিদওয়ানায় জমিতে অবতরণ করে চেতক হেলিকপ্টারটি। ওই চপারে কোনও ভিআইপি ছিলেন না। ইঞ্জিন চিপ সতর্কতা লাইটের কারণে চেতক হেলিকপ্টারটি জরুরি অবতরণ করে, সমস্যা মিটতেই হেলিকপ্টারটি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

ভারত দ্রুত ইউরিয়াতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

ধানবাদ, ১ মার্চ (হি.স.): ভারত দ্রুত ইউরিয়াতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত করতে হবে আমাদের। এখন ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতির মধ্যে একটি।' প্রধানমন্ত্রী মোদী শুক্রবার ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের এক অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যের জন্য একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, উৎসর্গ ও শিলান্যাস করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা এইমাত্র দেখেছি, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের জিডিপি ডেটা অনুসারে, ভারতীয় অর্থনীতি ৮.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে)। এতেই বোঝা যায় ভারতের সামর্থ্য কত গতিতে বাড়ছে! "বিকশিত ভারত" গড়ার জন্য আমাদের "বিকশিত ঝাড়খণ্ড" তৈরি করতে হবে।' মোদী বলেছেন, 'ঝাড়খণ্ড আজ ৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি প্রকল্পের উপহার পেয়েছে। আমি আমার কৃষক ভাইদের, আদিবাসী সমাজের মানুষ এবং ঝাড়খণ্ডের মানুষকে এই প্রকল্পগুলির জন্য অভিনন্দন জানাই।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৮৩ ডলারে পৌঁছেছে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারে পৌঁছেছে। শুক্রবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৪ টাকা প্রতি লিটারে উপলব্ধ।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের পঞ্চম দিনে প্রথম দিকে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.৩৪ ডলার বা ০.৪২ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮২.২৫ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ০.২৭ ডলার বা ০.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৮.৫৩ ডলারে লেনদেন করছে।

সংসদের নিরাপত্তা বিচ্যুতি : আইনজীবী বদলালো ৬ অভিযুক্তই, ১১ মার্চ ফের শুনানি

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : সংসদে নিরাপত্তা বিচ্যুতির ঘটনায় অভিযুক্ত সকলেই নিজেদের আইনজীবী বদলালো। শুক্রবার সমস্ত অভিযুক্তকে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে পেশ করা হয়। ৬ অভিযুক্তের সবাই নিজেদের আইনজীবী বদল করেছে। এখন সব অভিযুক্তের প্রতিনিধিত্ব করবেন একজন আইনজীবীই। আগামী ১১ মার্চ মামলাটি পরবর্তী শুনানির জন্য ধার্য করেছে আদালত। ওই দিন পর্যন্ত সমস্ত অভিযুক্তের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদও বাড়ানো হয়েছে। নীলম আজাদ এদিন আদালতকে বলেন, তিনি কোমরে ব্যথায় ভুগছেন এবং তার এক্স-রে করা হয়েছে, কিন্তু ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না। আদালত আইনজীবীকে একটি উপযুক্ত আবেদন করতে বলেছেন।

লিজেন্ড তালিকায় আলভেজের নাম ফিরিয়ে আনলো বার্সা

বার্সিলোনা, ১ মার্চ (হি.স.) : এক নারীকে ধর্ষণের দায়ে ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলার দানি আলভেজকে সাড়ে ৪ বছরের কারাদণ্ড এবং দেড় লক্ষ ইউরো জরিমানার শাস্তি দেয় বার্সেলোনার একটি আদালত। এ কারণে বার্সেলোনা ক্লাবের কিংবদন্তি তালিকা থেকে আলভেজের নাম মুছে ফেলেছিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ক্লাবের ১২৫ বছরের ইতিহাসে ১০২ জন কিংবদন্তি ফুটবলারকে রাখা হয়েছে এই তালিকায়। দানি আলভেজের নাম রয়েছে তাদের মধ্যে। ক্যারিয়ারে মোট যে ৪৩টি শিরোপা জয় করেছেন আলভেজ তারমধ্যে ২৩টিই বার্সেলোনার জার্সিতে।

যে কারণে তিনি বার্সার কিংবদন্তি তালিকায় ঠাঁই পেয়ে যান।

ফের কলকাতায় অগ্নিকাণ্ড! এবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে স্কুলে আগুন

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.): ফের কলকাতায় অগ্নিকাণ্ড! শুক্রবার দুপুরে আগুন লাগল কলকাতার রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে তালতলা এলাকায় একটি স্কুলে। সেই সময় লি মেমোরিয়াল নামের প্রাথমিক স্কুলটিতে ক্লাস চলছিল। ফলে পড়ুয়ারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ।

ইতিমধ্যেই দমকলের তিনটি ইঞ্জিন সেখানে আগুন নেভানোর কাজ করছে। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলটির উপরতলায় আগুন লাগে। আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা না গেলেও প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট কিংবা এমনই কোনও বৈদ্যতিন

মার্চের শুরুতেই দার্জিলিং জেলায় ঢুকছে তিন কোম্পানি বাহিনী

শিলিগুড়ি, ১ মার্চ (হি. স.) : লোকসভা ভোট ঘোষণা হওয়ার আগেই মার্চের প্রথমদিনেই রাজ্যে ঢুকে পড়ছে ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুক্রবার দার্জিলিং জেলায় আপাতত তিন কোম্পানি বাহিনী আসছে। এর মধ্যে দার্জিলিং পাহাড়ে দুই কোম্পানি এবং শিলিগুড়িতে এক কোম্পানি বাহিনী থাকবে। কালিম্পংয়ে আসছে দুই কোম্পানি বাহিনী। এই এক কোম্পানি বাহিনী থাকবে খড়িবাড়ি তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয়ে। এই বাহিনী ইতিমধ্যেই খড়িবাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে। তবে, স্কুল চলায় এখনও বাহিনী স্কুলে ঢুকতে পারেনি। দুপুরের পর বাহিনী স্কুলে ঢুকবে। কোচবিহার থেকে এই এক কোম্পানি বাহিনী এসেছে বলে খবর।

পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা দলের কাছে পয়েন্ট হারালো রোনাল্ডোহীন আল নাসর

রিয়াদ, ১ মার্চ (হি.স.) : পয়েন্ট টেবিলের ১৮ নম্বর স্থানে থাকা দলের কাছে পয়েন্ট হারাল রোনাল্ডোহীন আল নাসর। সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে বৃহস্পতিবার (২৯ ফেব্রুয়ারি) রাতে তালিসকার হ্যাটট্রিক করার পরও আল-হাজেমের বিপক্ষে ৪-৪ গোলে ড্র করেছে আল নাসর। ম্যাচে তাঁরা পর পর ৪ বার লিড নিয়েছিল।

উল্লেখ্য, আগের ম্যাচে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির কারণে এক ম্যাচে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে এই ম্যাচে ছিলেন না নাসরের ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো।

এই ড্র শিরোপার দৌড়ে আল-হিলালের সঙ্গে ব্যবধানটা আরও বেড়ে গেল আল-নাসরের।

২১ ম্যাচে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আল-হিলাল। ২২ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে অবস্থান রোনাল্ডোদের। সমান ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৮তম স্থান থেকে ১৭তম স্থানে উঠে এসেছে আল-হাজেম।

পৃষ্ঠা প্রমুখরা বিজেপির মূল চালিকা শক্তি: বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১ মার্চ।। পৃষ্ঠা প্রমুখরা বিজেপির মূল চালিকা শক্তি। তাদের কল্যাণে রাজ্যে বিজেপির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রে পুনরায় বিজিবি নেতৃত্বাধীন সরকার পুণ প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করলেন পৃষ্ঠা প্রমূখরা।

পৃষ্ঠা প্রমুখরা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাণ ভোমরা। বহু প্রতিবন্ধকতা আর রক্তচক্ষুকে হেলায় ঠেলে দিয়েই একটা সময়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে ছিল দেবতুল্য কার্যকর্তা তথা পৃষ্ঠা প্রমুখরা। তাদের নিবিড় জনসংযোগ ও মোদীজির প্রতি আস্থা, দীর্ঘ অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে গোটা রাজ্যবাসীকে মুক্ত করতে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। রাজ্যে আজ জনতার সরকার প্রতিষ্ঠিত। দেশের মূল বিকাশ ধারায় সম্পৃক্ত হয়েছে ত্রিপুরা। এই ভাবেই কথাগুলো বলেন খোয়াই জেলা বিজেপি সভাপতি বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার ২৭-কল্যানপুর- প্রমোদনগর মন্ডলের উদ্যোগে ভারতীয় জনতা পার্টির পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তরুণতুর্কি বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা সভাপতি বলেন সংগঠনের মান, পৃষ্ঠাপ্রমূখদের সম্মান।পৃষ্ঠা প্রমুখদের প্রাণবন্ততা, দায়িত্বের প্রতি একাগ্রতা ও উচ্ছ্বাস সংগঠনকে ভীষণভাবে উজ্জীবিত করে।

পৃষ্ঠা প্রমুখরাই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম স্তরের পথপ্রদর্শক, প্রাণশক্তি। এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ স্থানীয় নতুন মোটর স্ট্যান্ডের মঞ্চে বিধানসভা কেন্দ্রের ৫৬টি বুথের ৮৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত পৃষ্ঠা প্রমুখকে নিয়ে শুরু হয় সম্মেলনের কাজ। দলীয় শিষ্টাচার মতো প্রথমেই ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং জাতীয় সংগীত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের প্রদেশ কমিটির সহ-সভাপতি সুবল ভৌমিক, খোয়াই জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত পৃষ্ঠা প্রমুখ অর্ডিনেটর রূপম দত্ত, রাজ্য নেতৃত্ব সুভাষ সরকার, যুব নেতৃত্ব সোমেন গোপ, ইন্দ্রানী দেববর্মা প্রমূখ। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ রাখেন বিধানসভা কেন্দ্রের অন্যতম নেতৃত্ব চয়ন রায়।

মাঝ রাস্তায় এক মহিলার লঙ্কা কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১ মার্চ।। মেলাঘর শহরে লংকা কান্ড ঘটালো এক অজ্ঞাত মহিলা। আর ওই মহিলার কারণে আধ ঘন্টার উপর যানজট লেগে যায় বাজারে, ভোগান্তির শিকার হতে হয় বিভিন্ন যানবাহন ও সাধারণ মানুষকে। কিন্তু পুলিশ দেখেও না দেখার ভাব দেখিয়ে এড়িয়ে গেলেন।

মেলাঘর মাতৃ ভান্ডারের সামনে মূল সড়কে অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলা নেশাগ্রস্ত অবস্থা মাঝ রাস্তায় শুয়ে থাকে। তখন বাজারে থাকা লোকজন ওই মহিলাকে মূল সড়ক থেকে সরানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও মূল সড়ক থেকে সরাতে পারেনি।

পুলিশের একটি গাড়ি ঘটনাস্থল দিয়ে যাওয়ার সময় সাধারণ মানুষ পুলিশ কে জানালেও মহিলা কনস্টেবল নেই বলে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে মহিলা কনস্টেবল নিয়ে এসে রাস্তায় পড়ে থাকা ঐ মহিলাকে উদ্ধার করার জন্য কোন ভূমিকায় গ্রহণ করেনি পুলিশ।

শেষ পর্যন্ত মেলাঘর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা গিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা ওই অজ্ঞাত পরিচয় মহিলাকে মূল সড়ক থেকে উদ্ধার করে রাস্তার পাশে নিয়ে যায়। সাধারণ মানুষের অভিযোগ ওই মহিলা অতিরিক্ত নেশা করে মূল সড়কে লংকা কান্ডটি ঘটিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৈলাসহরে শান্তিপূর্নভাবে সম্পন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ মার্চ।। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের সাথে কৈলাসহরেও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সারা রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে শুক্রবার দুপুর বারোটা থেকে শুরু হয়েছে কৈলাসহর রাধা কিশোর ইনস্টিটিউশনে উচ্চমাধ্যমিকের ইংরেজি পরীক্ষা শুরু হয়। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা সম্পূর্ন হয়েছে কৈলাসহর রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশনে।

কৈলাসহর রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশনে মোট পরীক্ষার্থীর ছাত্র''র সংখ্যা ১৫৩ জন যার মধ্যে পরীক্ষায় বসেছে ১৫২ জন। মোট পরীক্ষার্থীর ছাত্রীর সংখ্যা ১৫৫ জন,। যার মধ্যে পরীক্ষায় বসেছে ১৫৩ জন। আজ সংবাদমাধ্যমকে এমনটাই জানান কৈলাসহর রাধা কিশোর ইনস্টিটিউশনের পরীক্ষা চলাকালীন সময়ের ভেনু সুপার দেবদাস সিনহা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

জনজাতি, তপশিলী জাতি, ওবিসি, সংখ্যালঘু, কর্মচারি,পেনশনার সহ সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করা হয়েছে। আজ বিধানসভায় নিজ অফিসকক্ষে সাংবাদিকদের কাছে বাজেটের উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অর্থমন্ত্রী আজ বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য মোট ২৭৮০৪.৬৭ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেন। বাজেটে রাজ্যে নিজস্ব রাজস্ব শুল্ক অনুমান করা হচ্ছে ৩ হাজার ৭৪৮ কোটি টাকা, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে তুলনায় ১১.৫৫ শতাংশ বেশি। রাজ্যের অনুমিত মূলধন খরচ ৬,৬৩৩.৮০ কোটি টাকা, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ২৩.৮০ শতাংশ বেশী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই গুরুত্ব দিয়ে বাজেট তৈরি করা হয়েছে। বাজেটে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ১৭২৬.২৩ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য বাজেটে ১৭২১৯৪ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ১৯.৮৮ শতাংশ বেশী। এবারের বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে ৫৫০৮.৬৩ কোটি টাকার সংস্থান

রাখা হয়েছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ১১.৫৪ শতাংশ বেশী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাজেটে উত্তর ত্রিপুরার যুবরাজনগর এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুরাতন আগরতলায় দুটি নতুন কৃষি মহকুমা খোলার প্রস্তাব রয়েছে। অরুন্ধতীনগরস্থিত রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে একটি রেসিডুয়েল টেস্টিং ল্যাব এবং একটি 'জার্ম প্লাজম প্রিজার্ভেশন সেন্টার' স্থাপন করা হবে। এরজন্য বাজেটে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৮টি নতুন কৃষি উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে, যার জন্য ২৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। তৈদুতে ইন্দো-ডাচ প্রকল্পে সাইট্রাসের উপর একটি 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৯ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গুণমান সম্পন্ন ফল, ফুল, শাকসব্জি চাষের লক্ষ্যে ইন্দো-ইজরাইল অ্যাকশন প্ল্যানের অন্তর্গত লেম্বুছড়ায় ফুলের উপর একটি 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' গড়ে তোলা হবে। এরজন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাছের পোনার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চারটি মৎস্যচাষ জ্ঞান কেন্দ্র এবং একটি রাজ্য মৎস্য চাষ সচেতনতা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এর জন্য ব্যয় হবে ১৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। আর আই ডি এফ-এর অর্থানুকুল্যে ২১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। এরজন্য ১২৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। পিএম-ডিভাইন প্রকল্পে আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজে এবং জিবিপি হাসপাতাল কমপ্লেক্সে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাল্টি কেয়ার হেলথ ইউনিট নির্মাণ করা হবে। এরজন্য বাজেটে ১৯২ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মিশন শক্তির আওতায় নিঃস্ব মহিলাদের জন্য মাতাবাড়ি এবং তেলিয়ামুড়ায় দুটি 'শক্তি সদন' স্থাপন করা হবে। এরজন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১০ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাবার সিট প্রক্রিয়াকরণের জন্য রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ৫০টি 'স্মোক হাউজ' তৈরী করা হবে। এরজন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ৫০ আসন বিশিষ্ট ১১টি জনজাতি ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল এবং ১০টি জনজাতি ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা হবে। এরজন্য বাজেটে ৭৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়া ১৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তীর্থমুখ মেলা প্রাঙ্গণের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাত নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার টিটিএএডিসি-কে ৬৯৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা প্রদান করবে। এই অর্থ পঞ্চম রাজ্য অর্থ কমিশনের টিটিএএডিসি এলাকার ভিলেজ কাউন্সিলের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে পৃথক এবং অতিরিক্ত। জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নে মোট বরাদ্দের ৩৯.৯৩ শতাংশ অর্থ এই বাজেটে ট্রাইবেল সাব প্ল্যানে সংস্থান রাখা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে কর্মরত সমস্ত বিডিও-দের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নতুন যানবাহন দেওয়া হবে। পাশাপাশি বর্তমানে রাজ্যের যেখানে বিডিও, অতিরিক্ত বিডিও এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক-দের জন্য সরকারি আবাস নেই, সেই সমস্ত স্থানে সরকারি আবাস নির্মান করা হবে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার জনস্বাস্থ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সে দিকে লক্ষ্য রেখেই ২০২৪-২৫ সালের বাজেটে জনস্বাস্থ্যের জন্য ১৩৯.৯৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। রাজ্যে 'ল্যান্ড ব্যাঙ্ক' গড়ে তোলার মাধ্যমে অব্যবহৃত জমির উন্নয়ন করে তা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য লীজ দেওয়া হবে। এই ধরনের সরকারী জমি সংলগ্ন বেসরকারি/ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিগুলিকে প্রয়োজনে ক্রয় করে সরকারী জমির পাশাপাশি এর উন্নয়নে সরকার উদ্যোগ নেবে। এর জন্য বাজেটে ১০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ২৮৫ কিমি রাস্তার উন্নতিকরণ, ১৯০০ কিমি রাস্তার সংস্কার, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ৫০০ কিলোমিটার রাস্তার পুনঃ সংস্কার এবং ১০টি নতুন আর সি সি ব্রীজ নির্মাণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ৩০৩ কিলোমিটার রাস্তার উন্নতিকরণের মাধ্যমে ২০টি জনপদে সকল ঋতুর উপযোগী রাস্তা নির্মাণ করা হবে। রাজ্যের ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রে রাস্তার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী ৪ বছরে ২,০০০ (দুই হাজার) কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এর ফলে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৩০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণ বা পুনঃসংস্কার করা হবে।

সুব্রত

● প্রথম পাতার পর

হোস্টেল এবং ১০টি জনজাতি ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা হবে।এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতিদের উন্নয়নে প্রায়স চালিয়ে যাচ্ছে। তার জন্য বাজেটে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার টিটিএএডিসি-কে ৬৯৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা প্রদান করবে। এই অর্থ পঞ্চম রাজ্য অর্থ কমিশনের টিটিএএডিসি এলাকার ভিলেজ কাউন্সিলের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে পৃথক এবং অতিরিক্ত। জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নে মোট বরাদ্দের ৩৯.৯৩ শতাংশ অর্থ এই বাজেটে ট্রাইবেল সাব প্ল্যানে সংস্থান রাখা হয়েছে বাজেটে।এদিন তিনি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জনকল্যাণমুখী বাজেট পেশ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা এবং অর্থ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

পরিশ্রুত পানীয় জল মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক ডিডাব্লিউএস।

ছদ্মবেশী বিজেপি', 'বড় সাইজের শাহজাহান'প্রকাশ্যেই সুদীপকে তোপ কুণালের'

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.): এক্স হ্যান্ডলে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের পোস্টে দিনভর জল্পনার মাঝেই তিনি শুক্রবার প্রকাশ্যেই তোপ দাগলেন দীর্ঘদিনের সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।একটি বেসরকারি চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে কুণাল বলেন, শাহজাহান প্রসঙ্গে তৃণমূলের অনেকে বলছেন, ''আগে জানতাম না''। উত্তর কলকাতার সাংসদ সম্পর্কে ভবিষ্যতে যদি প্রশ্ন বা বিতর্ক ওঠে, তখনও কি দলের তরফে এই সাফাই উঠবে ''জানতাম না?'' দলের ওপরমহলে এসব বিশদে জানিয়েছেন? প্রশ্নের উত্তরে কুণাল বলেন, ''দল বুঝবে ওসব। আমি ছোট নেতা। যেটুকু দায়িত্ব দিয়েছে পালন করার চেষ্টা করি!''সুদীপের নাম ধরেই চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে কুণাল বলেন, ''উনি তো বিজেপি-র দালাল। মামলা থেকে ওঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে মোদী সরকার। উনি বড় নেতা। ক্ষমতা থাকে বহরমপুরে গিয়ে অধীরের বিরুদ্ধে লড়ুন না!তৃণমূলের অন্দরের খবর, আগামী ১০ মার্চ তৃণমূলের ব্রিগেডের প্রস্তুতি নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে উত্তর কলকাতার নেতাদের একটি বৈঠক ডেকেছিলেন সুদীপ। সেখানে ডাক পাননি কুণাল। তাতেই তিনি ক্ষুব্ধ হন। অনেকের মতে, সেই কারণেই তিনি বৃহস্পতিবার রাতের পোস্টটি করে থাকতে পারেন। যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে সে কথা কেউই স্বীকার করছেন না। শুক্রবারের পোস্টেও তেমন কোনও ক্ষোভের উল্লেখ তিনি করেননি।পোস্টে কুণাল কারও নাম করেননি। তবে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, কাদের কথা বলতে চেয়েছেন তিনি। দু'টি আলাদা বিরোধী দলের নেতা বলতে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধীর চৌধুরীর কথা কুণাল বোঝাতে চেয়েছেন বলে অনেকের মত। সুদীপ লোকসভায় তৃণমূলের সংসদীয় দলের নেতা। অধীর লোকসভায় কংগ্রেস দলনেতা।বস্তুত, তৃণমূল মুখপাত্র হিসাবে কুণাল দীর্ঘ দিন ধরেই দাবি করে এসেছেন, অধীরের সঙ্গে মোদী তথা বিজেপির সখ্য রয়েছে। সেই বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই অধীর বহরমপুরে জেতেন। তবে সুদীপ-বিজেপি বোঝাপড়া বোঝাতে গিয়ে রোজভ্যালি প্রসঙ্গ টেনেছেন কুণাল। এই মামলাতেই সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়ে বেশ কয়েক মাস ভুবনেশ্বর জেলে কাটাতে হয়েছিল সুদীপকে।

কুণাল-ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য, বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়ার কারণে সেই মামলা নিয়ে সুদীপকে আর ঝক্কি পোহাতে হয় না। কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের যে অংশ সরব, তাঁদের বিরুদ্ধেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।জল্পনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার রাতে। এক্স হ্যান্ডলেই কুণাল রাতে লেখেন, ''নেতা অযোগ্য গ্রুপবাজ স্বার্থপর। সারা বছর ছ্যাঁচড়ামি করবে আর ভোটের মুখে দিদি, অভিষেক, তৃণমূল দলের প্রতি কর্মীদের আবেগের উপর ভর করে জিতে যাবে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করবে, সেটা বার বার হতে পারে না।''ওই পোস্টটিতেও কুণাল কারও নাম করেননি। ফলে কৌতূহল তৈরি হয়েছিল, কাকে ইঙ্গিত করছেন কুণাল? ক্রমে তা প্রকাশ্যে এসেছে। চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে তুলোধোনা করার চেষ্টা করেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সুদীপকে ভূষিত করেছেন 'ছদ্মবেশী বিজেপি', 'বড় সাইজের শাহজাহান' অভিধায়।

বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন সাংসদ বিবি পাতিল

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের আগে আরও একটি ধাক্কা খেল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)। তেলেঙ্গানার জহিরাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বিআরএস সাংসদ বিবি পাতিল শুক্রবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বিজেপি সদর দফতরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর, ডক্টর কে লক্ষ্মণ এবং মহাসচিব তরুণ চুগের উপস্থিতিতে পাতিল বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। পাতিল শুক্রবার বিজেপিতে যোগ দিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেছেন যে তিনি গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নমূলক কাজে মুগ্ধ হয়ে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বর্তমান সরকার স্বচ্ছ ভারত অভিযান, নারী কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে প্রভূত উন্নতিসাধন করেছেন।এর আগে বৃহস্পতিবার বিআরএস সাংসদ পোথুগান্তি রামুলু বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।

স্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সে। যদিও সে পুরোপুরি সুস্থ হয়নি, মাথাতে অসহ্য যন্ত্রণা ছিলো। অর্থের অভাবে ঠিকমত চিকিৎসা করাতে পারেনি, তার উপর বিভিন্ন সময়ে স্বামী ফোন করে হুমকি ধমকি দিতো বলে অভিযোগ। এতে মানসিক অবসাদে ভুগছিলো পলি। এই কারনে পলিরানী বৃহস্পতিবার বিকেলে বাপের বাড়িতে ঘরের পেছনে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। মৃতার তিন বছরের একটি শিশু কন্যা রয়েছে। স্বামীর কারনেই এই আত্মহত্যা বলে অভিযোগ পলির বাপের বাড়ির লোকজনদের।

ইঙ্গিত প্রদ্যোতের

● প্রথম পাতার পর

পৃথক বিমানে চেপেছেন। এবিষয়ে যোগাযোগ করা হলে বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য কিছু জানাতে রাজি হননি। আসুন দিনের জন্য অপেক্ষা করি। কিছু ঘটলে তা প্রকাশ্যে জানানো হবে, বলেন তিনি।

সূত্র দাবি করেছে যে সকাল সাড়ে এগারটায় জাতীয় রাজধানীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে বহু প্রতীক্ষিত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবে। কেন্দ্র ও রাজ্যের সকল সিনিয়র কর্মকর্তারা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে কথা বলার সময়, টিটিএএডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা বলেন, 'আমরা বুবাগরা থেকে একটি ফোন পেয়েছি। তিনি আমাদের দিল্লিতে ছুটে যেতে বলেছেন। আমি মনে করি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাথে একটি বৈঠক রয়েছে।'

পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন গোটা জেলার ৩ টি মহকুমা মিলে ৮টি সেন্টার ও ১৩ টি ভ্যানু রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষার জন্য। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩হাজার৩৯৫ জন। তার মধ্যে ২ টি মাদ্রাসা থেকে সোনামুড়ার দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৯ জন পরীক্ষার্থী ফাজিল পরীক্ষা দিয়েছে। এদিকে কৈলাসহরেও আজ দুপুর বারোটা থেকে শুরু হয় কৈলাসহর রাধা কিশোর ইনস্টিটিউশনে উচ্চমাধ্যমিকের ইংরেজি পরীক্ষা। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা সম্পূর্ন হয়েছে কৈলাসহর রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশনে। কৈলাসহর রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশনে মোট পরীক্ষার্থীর ছাত্র'র সংখ্যা ১৫৩ জন যার মধ্যে পরীক্ষায় বসেছে ১৫২ জন। মোট পরীক্ষার্থীর ছাত্রীর সংখ্যা ১৫৫ জন,। যার মধ্যে পরীক্ষায় বসেছে ১৫৩ জন। আজ সংবাদমাধ্যমকে এমনটাই জানান কৈলাসহর রাধা কিশোর ইনস্টিটিউশনের পরীক্ষা চলাকালীন সময়ের ভেনু সুপার দেবদাস সিনহা।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

মতবিনিময় সভায় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু গোমতী জেলায় রূপায়িত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের খোঁজ খবর নেন। সভায় রাজ্যপাল উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে আধিকারিকদের নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মতবিনিময় সভায় রাজ্যপাল বলেন, প্রবীণ নাগরিক সহ রাজ্যের জনগণ যাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির সুবিধা যথাযথভাবে পেতে পারেন সেজন্য প্রকল্পগুলির সুফলের কথা তুলে ধরতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির উপর বেশী করে গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্যপাল বলেন, কৃষি, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্যচাষ গ্রামীণ এলাকার মানুষকে স্বনির্ভর করতে সহায়ক ভূমিকা নিতে সক্ষম। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ ও পানীয়জলের সুবিধা মতবিনিময় সভায় রাজ্যপাল বলেন, উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।

মোদী-মমতার বৈঠক

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : প্রোটোকল মানতেই যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রাজভবনে দেখা করতে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তা আগেই অনুমান করা গিয়েছিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর রাজভবন থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা সে কথাই জানালেন।শুক্রবার আরামবাগে সভা করে বিকেলে কলকাতায় রাজভবনে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এর পরেই রাজভবনে মোদীর সঙ্গে দেখা করতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা। বৈঠক শেষে মমতা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, এখনও ভোট ঘোষণা হয়নি। রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি এলে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েই থাকে। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া। মমতা বলেন, ''রাজভবনে এসেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম। রাজ্যের কথাও বললাম। আর গল্প করলাম। রাজনীতির কথা কম, গল্পই বেশি হল।''কেন্দ্রের কাছে 'বকেয়া' নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও কথা হয়েছে কি না, তা নিয়ে জানতে চাওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তিনি বলেন, ''হ্যাঁ, সে সব নিয়ে আমার যা বলার বলে দিয়েছি।''

বাজেট পেশ

● প্রথম পাতার পর

হবে। এরজন্য ব্যয় হবে ৪ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ সালে 'প্রধানমী জনবিকাশ কার্যক্রমের' আওতায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে 'মুখ্যমী সামাজিক সহায়ক প্রকল্পের' আওতায় আরও ২৯ হাজার ৪১০ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এরজন্য বার্ষিক অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা করা হবে ৭০ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। তিনি জানান, ভারত সরকারের 'মিশন শক্তির' আওতায় অসহায় মহিলাদের জন্য মাতাবাড়ি ও তেলিয়ামুড়ায় ২টি 'শক্তি সদন' স্থাপন করা হবে ১০ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। যেসব জনবসতিগুলিতে আদিম ও প্রান্তিক জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন সেখানে ৭৭টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (এডব্লিউসি) ৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্থাপন করা হবে। মোট ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় রাবার শিট প্রক্রিয়াকরণের জন্য ৫০টি মোক হাউস নির্মাণ করা হবে। ৭৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জনজাতি ছাত্রীদের জন্য ১১টি এবং জনজাতি ছাত্রদের জন্য ১০টি ৫০ আসন বিশিষ্ট হোস্টেল নির্মাণ করা হবে। তীর্থমুখ মেলা প্রাঙ্গণে ১৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার সর্বমোট ৬৯৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা টিটিএএডিসি'কে সরাসরি প্রদান করবে। এই পরিমাণ তহবিল টিটিএএডিসি এলাকার গ্রাম পরিষদগুলির জন্য ৫ম রাজ্য আর্থকমিশনের অধীনে করের অংশ থেকে হস্তান্তরিত তহবিলের অতিরিক্ত। এছাড়াও রাজ্য সরকার জনজাতি ভাই বোনেদের কল্যাণে মোট উন্নয়ন বরাদ্দের ৩৯.৯৩ শতাংশ ধার্য করেছে। ২০২৪-২৫ সালে রাজ্য সরকার ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমস্ত বিডিওদের নতুন গাড়ি সরবরাহ করবে। বর্তমানে যেখানে আবাসন নেই সেইসব জায়গায় সমস্ত বিডিও, অ্যাডিশনাল বিডিও ও এডিএমদের জন্য আবাসন নির্মাণ করা হবে। রাজ্য সরকার স্বচ্ছতার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০২৪-২৫ সাল থেকে শুধুমাত্র স্বচ্ছতার জন্য নতুন ডিমাণ্ড খোলা হয়েছে, বরাদ্দ করা হয়েছে ১৩৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা।

অর্থমী জানান, রাজ্য সরকার স্বামিত্ব প্রকল্পের আওতায় সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সহযোগিতায় বিদ্যমান রাজস্ব মানচিত্র হালনাগাদ করার জন্য জমির জরিপ করবে। একটি 'ভূমি ব্যাঙ্ক' চালু করা হবে, যার অধীনে অব্যবহৃত সরকারি জমির উন্নীতকরণ হবে। তারপর সেই উন্নীত জমি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে লিজ দেওয়া হবে। প্রয়োজনে সরকারি জমির আশেপাশে থাকা বেসরকারি জোত জমিও ক্রয় করা হবে এবং সেই জমি সরকারি জমির মত করেই উন্নীতকরণ করা হবে। এই যোজনা বাস্তবায়নের জন্য ১০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ৩০ কিলোমিটার রাস্তার পুনর্বিন্যাসের জন্য ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্র জড়ে সড়ক পরিকাঠামোগত কাজের জন্য পরবর্তী ৪ বছরের সময়কালে ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। ৮টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প নির্মাণ করা হবে। ১১টি লিফট ইরিগেশন স্কিম ও ১৮৩টি ডিপটিউবওয়েল স্থাপন করা হবে। এটি ১১০ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত ২ হাজার ৫০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনবে। নাবার্ড তহবিল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নদীর তীরে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধক ব্যবস্থা তৈরির কাজের জন্য ১০০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। 'পিএম-জনমন'-এর আওতায় ৬৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আদিম ও প্রান্তিক জনজাতি গোষ্ঠীর বসবাসকারী সমস্ত বসতিতে বিদ্যতায়ন করা হবে। নারী ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যকর পাবলিক টয়লেট তৈরি করতে বিভিন্ন শহরে ৮৫টি 'পিঙ্ক টয়লেট' নির্মাণ করা হবে, মোট ৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে।

কৈলাসহরে চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

আসে। এবং তাদের এই ঝামেলা মিটমাট করার চেষ্টা করে। অভিযোগ তখন নাকি সত্যজিৎ সিনহা অনীশ সিনহার বাড়িতে প্রবেশ করে তার রান্নার সামগ্রী লাথি মেরে ফেলে দেয়। এরপর অনীশ সিনহা তা প্রতিবাদ করতে গেলে সত্যজিৎ সিনহা তাকে নাকি বেধড়কভাবে মারপিট চালায় বলে অভিযোগ। এই মারপিট করার ফলে সত্যজিৎ সিনহা গুরুতরভাবে আহত হয় বর্তমানে সত্যজিৎ সিনহা গুরুতরভাবে আহত অবস্থায়। কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই মারপিট করার ফলে অনীশ সিনহার ঘরের সীমানার বেড়া ভেঙ্গে যায়। উক্ত বিষয় নিয়ে ঐদিন রাত্রিবেলা অনীশ সিনহা কৈলাসহর থানায় সত্যজিৎ সিনহার বিরুদ্ধে একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করে। অনীশ সিনহা বলে ওর ঘরে মাংস রান্না নিয়ে বাধা দেয় সত্যজিৎ সিনহা কেননা সত্যজিৎ সিনহার বাড়িতে একটি মহাদেবের মন্দির রয়েছে যার কারণে তাকে মাংস রান্না করতে বাধা দেয়। আর তা নিয়েই এই মারপিটের ঘটনাটি ঘটে। সত্যজিৎ সিনহা ঐদিন রাত্রিবেলা ওই একই এলাকার একটি বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছিল যার ফলে উনার ছেলের পড়াশোনা করতে অসুবিধা হচ্ছিল। পরবর্তী সময় তা উনার ছেলে উনাকে বলেছে ওই বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি করার ফলে আমার পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটছে। আর তা সত্যজিৎ সিনহা জিজ্ঞাসা করতে গেলেই নাকি উনাকে বেধড়কভাবে মারপিট চালায় চার পাঁচ জন লোক মিলে বলে তিনি অভিযোগ করেছিলেন। যার ফলে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন এবং তিনি বর্তমানে কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উক্ত বিষয় নিয়ে চলতি মাসের ২৮ তারিখ সত্যজিৎ সিনহা ওই একই এলাকার চার থেকে পাঁচজনের বিরুদ্ধে কৈলাসহর থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন। আজ বিকেলবেলা উনার তোলা সমস্ত অভিযোগ খন্ডন করে অনীশ সিনহা এবং সে সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার জন্য সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়। তবে যাই হোক উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়।

৪৬

● প্রথম পাতার পর

সবসময় স্থাপত্যবিদদের অনুরোধ করেন যেন খোলা বারান্দা বা ভেন্টিলেশন এবং অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

বাংলাদেশের সরকার প্রধান বলেন, কিন্তু স্থাপত্যবিদরা সেভাবে নকশা করেন না আবার মালিকরা এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়তে চায়না। ৪৬ জন মানুষ মারা গেছে। এরচেয়ে দু:খ ও কষ্টের আর কী হতে পারে। অথচ আমরা ফায়ার এক্সটিংগুইসার লাগানোসহ অগ্নি নির্বাপন পথের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ বার বার দিচ্ছি। সেটা কিন্তু তারা মানে না।

ক্রীড়াঙ্গন

আগামীকাল থেকে নাইডু সেমিফাইনালে

উত্তর প্রদেশ-মুম্বাই, বিদর্ভ-কর্ণাটক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামী ৩ মার্চ থেকে অনুষ্ঠিত হবে। একটি উত্তর প্রদেশ বনাম মুম্বাই-এর মধ্যে। খেলা কানপুরে গ্রীন পার্ক স্টেডিয়ামে। অপরটি বিদর্ভ বনাম কর্ণাটকের মধ্যে। খেলা নাগপুরে কালাম্না গ্রাউন্ডে। বিজয়ী দুইদলের মধ্যে ফাইনাল ম্যাচ শুরু হবে ১০ মার্চ থেকে। ফাইনাল ম্যাচের স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। উল্লেখ্য, প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় উত্তর প্রদেশ সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ড্র ম্যাচ থেকে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে সেমিফাইনালে পৌঁছে। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে মুম্বাই দশ উইকেটের ব্যবধানে রেলওয়েজ কে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করে। একইভাবে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে বিদর্ভ ৪২ রানের ব্যবধানে তামিলনাড়ু কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ঝাড়খন্ড ও কর্নাটকের ম্যাচ ড্র তে শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে কর্ণাটক ছাড়পত্র পায় শেষ চারে খেলার। সেমিফাইনালের লড়াইয়ে জয় ছিনিয়ে কোন দু-দল ফাইনালে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলার ছাড়পত্র পায় তাই এখন দেখার বিষয়।

নাগাল্যান্ডে নর্থ-ইস্ট অলিম্পিকের জন্য রাজ্য দল চূড়ান্তকরণ কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। একাধিক স্পোর্টস ইভেন্টের রাজ্য সংস্থা এখনো রাজ্য দল চূড়ান্ত করেনি। ইতোমধ্যে রাজ্য দল গঠন করে যথারীতি উত্তর-পূর্ব অলিম্পিক আসরে নাম পাঠাতে হবে।

গত বছর ত্রিপুরা দল ১৫২ জনের জাম্বু টিম অংশগ্রহণ করে স্বর্ণ রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক মিলিয়ে ৪২ টি পদক পেয়েছিল বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। পূর্বোত্তর অলিম্পিকের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। নাগাল্যান্ডে নর্থ-ইস্ট অলিম্পিক গেমস ২০২৪ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ১৮ থেকে ২৩ মার্চ। ৬ দিন ব্যাপী আয়োজিত এই পূর্বোত্তর অলিম্পিক গেমসে অ্যথলেটিক্স, বক্সিং, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, ফুটবল, ফ্রিস্টাইল রেসলিং, লন টেনিস, টেবিল টেনিস, তাইকুন্ডু, ভলিবল, উশু, সেপাক টাকরো খেলা হবে। কোনইভেন্টে কতজন করে খেলোয়াড় অংশ নেবে, পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগে, তা পর্যন্ত নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন অ্যাথলেটিক্সে পুরুষ ও মহিলা থেকে ২২ জন করে, বক্সিংয়ে ১০ জন করে, ব্যাডমিন্টনে তিনজন করে, বাস্কেট বলে পুরুষ বিভাগে ১২ জন, ক্রিকেটে পুরুষ বিভাগে ১৫ জন, ফুটবলে পুরুষ বিভাগে ২০ জন, ফ্রিস্টাইল রেসলিং-এ পুলিশ বিভাগে ৬ জন মহিলা বিভাগে পাঁচ জন, লন টেনিসে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে তিনজন করে, টেবিল টেনিসে ৪ জন করে তাইকুন্ডোতে পুরুষ বিভাগে ৮ জন এবং মহিলা বিভাগ ৬ জন।

ভলিবলে পুরুষ বিভাগে ১২ জন, উশুতে পুরুষ বিভাগে সাতজন ও মহিলা বিভাগে তিনজন। সেপাক টাকরোতে পুরুষ বিভাগে ১৫ জন। অফিসিয়াল প্রতিটি ইভেন্ট থেকে দুইজন করে।

তবে ফুটবল, ক্রিকেট এর ক্ষেত্রে তা তিনজন করে অফিসিয়াল অংশ নেবে। রাজ্য দল যাবে পুরোপুরিভাবে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অনুমতি ও অনুমোদনক্রমে।

দল গঠনের পুরো দায়িত্ব প্রত্যেকটি ইভেন্টের রাজ্য সংস্থার হাতে। রাজ্য সংস্থাসমূহ নির্দিষ্ট উপায়ে রাজ্য দল গঠনের পর চূড়ান্ত দলের তালিকা তুলে দেবে দপ্তরের হাতে। এদিকে ত্রিপুরা স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা বিধায়ক গোপাল রায় এক জানিয়েছেন বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্টের রাজ্য অ্যাসোসিয়েশন গুলো, যেগুলো বিশেষ করে ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনের অনুমোদন প্রাপ্ত, তারাই দল গঠনের মাধ্যমে রাজ্য দল পাঠাতে পারবে। বেশ ক-টি রাজ্য সংস্থা যথারীতি নামের তালিকা তুলে দিয়েছে। যে সকল সংস্থা এখনও রাজ্য দল চূড়ান্ত করেনি, তাদের দ্রুত তালিকা জানাতে আহ্বান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অলিম্পিক আসরে খেলোয়ারদের যাতায়াতের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন দেখবে। সিলেকশন ট্রায়ালের ক্ষেত্রে কোনও রকম টি এ/ ডি এ দেওয়া হবে না। দপ্তর তিন মার্চের মধ্যে নামের তালিকা নেবে। স্টেট অলিম্পিক এসোসিয়েশন থেকে খেলোয়াড়দের টি-শার্ট প্রদান করা হবে বলে আগেই বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল।

লংতরাইভ্যালিতে টি-২০ ক্রিকেট শুরু কাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। সমস্যা মাঠ। এখনও খেলার জন্য পুরোপরি ঠিক নয়। ফলে বাধ্য হয়েই ২ দিন পিছিয়ে দেওয়া হলো আসর। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিলো লংতরাইভ্যালি মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র টি-২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনী দিনে দুটি ম্যাচ ছিলো। দিনের প্রথম ম্যাচে শান্তিনিকেতন সঙ্ঘ - তরুণ সঙ্ঘ এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ইয়ং ব্লাড - আইতরমা ক্লাব মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিসো। কিন্তু শেষ সময়ে মাঠ ঠিক না হওয়ায় আপাতত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৩ মার্চ রবিবার থেকে আসর শুরু হবে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে এখবর জানানো হয়েছে।

জাতীয় ক্রিকেটে পূর্বাঞ্চল দলে ত্রিপুরার অর্কজিৎ : অভিনন্দন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট খেলোয়াড় অর্কজিৎ রায়, বিসিসিআই পরিচালিত ভিজ্জি ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলীয় দলে স্থান পাওয়াতে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গঙ্গা প্রসাদ প্রসেইন সহ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড এর আধিকারিকরা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

সাফল্যের লক্ষ্যে গার্লস ক্রিকেট টিমের জোর প্রস্তুতি চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। লক্ষ্য নতুন প্রতিভা তুলে ধরা। পাশাপাশি রাজ্যকে প্রতিভাবান ক্রিকেটার উপহার দেওয়া। তা মাথায় রেখেই একঝাঁক নবাগত ক্রিকেটার নিয়ে এবছর দল গড়লো চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। সদর অনূর্ধ-১৩ এবং ১৫ বালকদের আসরে দ্বিমুকুট জয় করা চাম্পামুড়া নবাগত বালিকা ক্রিকেটারদের তুলে ধরতেই এবারের আসরে অংশগ্রহণ। তা স্পষ্ঠভাবেই জানান দলের কোচ কর্ণ দেবনাথ। দলকে এবছর নেতৃত্ব দেবেন অনূর্ধ-১৯ ত্রিপুরা দলের হয়ে খেলা জিয়া মন্ডল।

ডেপুটি হিসাবে থাকবেন মোনালি শর্মা।

আসরে সাফল্য পেতে যোগেন্দ্রনগর আদর্শ কলোনি মাঠে প্রতিদিন চলছে জোড় প্রস্তুতি। কর্ণ-র পাশাপাশি ক্রিকেটারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন রাজীব কুমার দাস এবং শঙ্কর দেবনাথ। শুক্রবার বিকেলে অনুশীলন শেষে এক সাক্ষাৎকারে কোচ কর্ণ বলেন, 'আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নতুন প্রতিভা তুলে ধরা। তা মাথায় রেখেই সেন্টারের ক্রিকেটারদের দিয়ে গড়া হয়েছে দল। আশাকরি মেয়েরা হতাশ করবে না। সাফল্য পাবেই'।

একসময় ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া সহ রাজ্য সিনিয়র দলের আরও দুই ক্রিকেটারকে দলে নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন সেন্টারের কর্তারা। শেষ পর্যন্ত ওই পরিকল্পনা থেকে সরে আসলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ফলাফল যা-ই হউক সেন্টারে অনুশীলনরত ক্রিকেটারদের নিয়েই গড়া হবে দল। মেয়েরা ভালো খেলবে আশাবাদী কোচ রাজীব কুমার দাস। চাম্পামুড়া দল: জিয়া মন্ডল (অধিনায়িকা), রিমশা কর্মকার, মোনালি শর্মা (সহ অধিনায়িকা), সানিয়া খাতুন, দিপীকা দেব (উইকেট রক্ষক), মৌমিতা দে, দিয়া সরকার, পূজা দাস, প্রীয়া সাহা, ইশা সাহা, অলঙ্কৃতা সাহা, অর্পিতা দাস, শায়নিকা দেব, শুক্লা চাকমা, মেঘা দাস এবং যমুনা দাস।

প্রেসক্লাবের চাইনিজ চেকার মিট আজ গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট -'২৪ চলছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত ইনডোর-আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হবে। গেমস এন্ড স্পোর্টসের ৮ম পর্যায়ে আগামীকাল চাইনিজ চেকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। মাসাধিককাল আগে ব্যাডমিন্টন সিঙ্গেলস এবং রাজ্য স্তরীয় আন্ত: প্রেসক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পর ইনডোর গেমস লুডো এবং পরে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে ক্যারাম টুর্নামেন্টের পর টেবিল টেনিস, দাবা প্রতিযোগিতার পর আগামীকাল চাইনিজ চেকার প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ব্যাডমিন্টন ডাবলস-এর পর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল বেলা ১১টায় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে সাংবাদিকদের মধ্যে চাইনিজ চেকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সচিব রমাকান্ত দে, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারপার্সন অলক ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে প্রেসক্লাবে রিপোর্ট করতে স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে আহ্বান রেখেছেন।

Border Area programme - Tripura 2024

Venue : Laxmilunga Gram Panchayet Office Premises, Bamutia, West Tripura
Date : 2nd March,2024 # Time : 4.00 PM

Organised by
North East Zonal Cultural Centre, Dimapur
Ministry of Culture, Government of India

in collaboration with
Department of Information & Cultural Affairs
Government of Tripura

Inaugurator
Smt. Shila Das Sen
Hon'ble Chairman, Bamutia Panchayet Samiti
Chief Guest
Smt. Papiya Das Nandi
Hon'ble Member, Paschim Tripura Zilla Parishad
Special Guests
Sri Krishnadhan Das
Hon'ble Ex-MLA
Smt. Puja Malakar
Hon'ble Vice-Chairman, Bamutia Panchayet Samiti
Sri Subrata Chakraborty
Hon'ble Vice-Chairman, State Level Cultural Advisor Committee
Sri Biju Pal
Eminent Social Activist
Guests of Honour
Sri Subhash Dutta
SDM, Mohanpur
Smt. Saptaparni Majumder
BDO, Bamutia R. D Block
Prseident
Smt. Aparna Das
Hon'ble Pradhan, Laxmilunga Gram Panchayet

All are cordially invited

Amrit Debbarma
Assistant Director
ICA, West District,
Agartala

Dr. Prashanna Gogoi
Director
NEZCC, Dimapur, Nagaland
Ministry of Culture, Govt. of India

ICA/D-1868/24

NOTICE INVITING e-TENDER NO. 32/EE(AGRI)/S/2023-24.

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	24/EE/AGRI/SOUTH/2023-24	Rs. 2,04,265.00	Rs. 4,085.00	15 Days	Up to 04.00. P.M. on 06/03/2024	At 11.00 AM on 07/03/2024
2	71/EE/AGRI/SOUTH/2023-24	Rs. 1,38,513.00	Rs. 2,770.00	20 Days		
3	72/EE/AGRI/SOUTH/2023-24	Rs. 2,35,944.00	Rs. 4,719.00	15 Days		
4	73/EE/AGRI/SOUTH/2023-24	Rs. 11,67,506.00	Rs. 23,350.00	20 Days		
5	74/EE/AGRI/SOUTH/2023-24	Rs. 19,47,663.00	Rs. 38,953.00	30 Days		
6	75/EE/AGRI/SOUTH/2023-24	Rs. 14,95,328.00	Rs. 29,907.00	20 Days		

For details, please visit website www.tripuratenders.gov.in and contact 03621-222486.

(Er. D. Jamatia)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
South, Udaipur.

ICA/C-4922/24

F.No.4(8)/SDM/JMP/CCB/2021-22/1737 Date:-2 9/02/2024
NOTICE INVITING QUOTATION

The undersigned on behalf of the Government of Tripura invites sealed covered Quotation in plain paper from bona-fide suppliers/Registered LAMPS/PACS etc .for supply of Traffic trolleys and Traffic Sign Boards during the year 2023-24. The suppliers/Lamps/Co- Operative Societies therefore requested to submit the actual rate of the said articles as per the given list (Annexure-I)

The Quotation should be super scribed by the words SUPPLY OF SDM's OFFICE MATERIALS (Disaster Management Section) during the 2023-24.

The Sealed quotation will be received up to 3.00 pm at office of the undersigned on or before 07/03/2024

The sealed quotation will be opened at 4:00 PM on 07/03/2024 in the chamber of the undersigned in presence of all the quotationers,

Format for Submission for Quotation

Sl No	Name of Items	Quantity	Specifications	Total cost including Taxes	Remarks
1.	Traffic Trolleys	1	"District Administration Sepahijala" should be written in large fonts over the trolleys		
2.	Traffic Sign Boards	1	01 set of 05 signboards viz. 1. "School Ahead" 2. "Drive Slow" 3. "Landslide prone area" 4. "Don't Drink & Drive" 5. 'Accident prone Zone"		

TERMS & CONDITIONS

Quotationer will deposit Rs.10,000/- (Rupees ten thousand) only in favour of the Sub- divisional magistrate (SDM), Jampuijala in the shape of Deposit at Call (D-Call) of any recognized Bank which will be retained in this office as 'Security Deposit' in case of successful quotationer. In case of failure to submit security deposit, quotation will be rejected.

Supplier should have a valid license from the competent authority.

Rates should be quoted in showroom price, and necessary taxes as applicable will be deducted from the bill at sources.

The successful quotationer will have to supply the material within five days from the date of receiving of the supply order.

Materials should be delivered to this office at HQ.

The undersigned reserves the right to cancel the whole tender process at any stage without assigning any reason.

Applicable taxes (GST/ncome Tax along with surcharge) if any, will be deducted from the

ICA/C-4915/24

Sub-Division Magistrate
Jampuijala Sepahijala

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

কংগ্রেস ও সিপিএম দল ত্যাগ করে ১৬৪ ভোটারের বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ মার্চ।। লোকসভা নির্বাচনের মুখে উত্তরে বিরোধী শিবিরে ভাঙন ক্রমশ তেজি হচ্ছে। ১৬৪ জন সংখ্যা লঘু ভোটেরকে ঘরে নিয়ে তোলতে সক্ষম হল বিজেপি। এবারের দল ত্যাগ ধর্মনগর মহকুমার ফুলবাড়ীতে। কংগ্রেস ও সিপিএম দল ত্যাগ করে ১৬৪ ভোটার যোগ দিলো গেরুয়া শিবিরে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের মুখে রাজ্যর দিকে দিকে চলছে দল বদলের হিড়িক। উত্তর জেলায় দল ত্যাগ শুরু হয়েছে। কুর্তি কদমতলা কেন্দ্রটি লাল দূর্গ হিসাবে পরিচিত। ১৯৭৮ সাল থেকে এই বিধানসভাটি বামেদের দেখলে। ২০১৮ এবং ২০২৩ সালের বিধান সভায় গেরুয়া বাহিনী সর্বশক্তি নিয়োগ করা সত্ত্বেও জয়ী হতে পারেনি। বর্তমান যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় ২০১৮সালে সাড়ে সাত হাজার ভোটে পরাজিত হয়ে কুর্তি কদমতলা ছাড়েন। সংখ্যা লঘু ভোটার বেশি।সংখ্যা লঘু ভোটাররা সব সময়েই বামেদের পকেট ভোট হিসাবে কাজ করেছে।এইরূপ বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৬ পরি বারের ১৬৪ জন সংখ্যালঘু ভোটার দের ঘরে তোলতে পেরে গেরুয়া শিবির উচ্চশিত।

শুক্রবার পরস্ত বেলায় কদমতলা ব্লক এলাকার চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব ফুলবাড়ী পঞ্চায়েতের খাদিমপাড়ার ৪৯ নং বুথে এই উপলক্ষে যোগদান সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় লোকমান উদ্দিন ও সাবুল মিয়ার নেতৃত্বে ৪৬ পরি বারের ১৬৪ জন সংখ্যালঘু ভোটার সি পি এম, কংগ্রেস দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে সামিল হয়। নবাগতদের বরণ করে নেওয়ার জন্য পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিলেন কদমতলা-কুর্তি বিধান সভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি রাজা ধর,বিজিত প্রার্থী তথা বর্তমান বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য দীলিপ তাঁতি, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষ দের সদস্যা মামনী রায় সহ বিভিন্ন পদা ধি কারিরা।উক্ত যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতারা রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন।নে তারা বলেন বস্তুত দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেস সিপিএমের গোপনে মিত্রতা ছিল।বর্তমানে প্রকাশ্যে আসার কারণে পরি স্কার হয়ে গেছে।কংগ্রেস এবং সিপিএম রাজ্যের সাধারণ জনগণের সর্বনাশ করেছে বলে অভিযুক্ত করা হয়।

বাইক ও গাড়ির সংঘর্ষে আহত বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ মার্চ।। উত্তর এবং উনকোটি জেলায় বাইক দুর্ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। এতে একদিকে যেমন অকালে তরতাজা প্রাণ হারিয়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে আহতদের সংখ্যা বাড়ছে। এতে জেলাবাসীর মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

এবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ধর্মনগর কৈলাসহর সড়কে। শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ এই সড়কের উনকোটি পাহাড় এলাকায় একটি বাইক ও একটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এই দুর্ঘটনার ফলে গুরুতরভাবে আহত হয় বাইক চালক।বা ইক চালকের নাম জানা যায়নি।বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই ব্যক্তি। স্থানীয় লোকজন দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে প্রথমে খবর পাঠায় কৈলাসহর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। অগ্নি নির্বাপক বাহিনী আহত বাইক চালককে উদ্ধার করে কৈলাসহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে বাইক চালকের অবস্থা গুরুতর। কৈলাসহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।

ফিনান্সিয়াল লিটারেসি উইক-২০২৪'র সমাপ্তি

আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সব বয়সের মানুষেরই সচেতন থাকা দরকার ঃ রাজ্যপাল

আগরতলা।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আয়োজিত ফিনান্সিয়াল লিটারেসি উইক-২০২৪ এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। আগরতলার পোলো টাওয়ারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সব বয়সের মানুষেরই সচেতন থাকা দরকার।ভোক্তাদের সুরক্ষার বিষয়ে তাদের আরও সচেতন করতে হবে।তারা যেন তাদের অর্থ সুরক্ষিত রাখতে পারেন এবং অধিকারও বজায় থাকে। রাজ্যপাল এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করেন।সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আরবিআই আগরতলার চিফ জেনারেল ম্যানেজার যশবন্ত সিং সাহোটা। বক্তব্য রাখেন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সুদীপ ভট্টাচার্য। ধন্যবাদসূকক বক্তব্য রাখেন মনোজ কে কুলকার্নি। আজ সকালে আরবিআই'র পক্ষ থেকে ওয়াকাথন'র আয়োজন করা হয়। তাতে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়।

বিজেপিতে সামিল কংগ্রেস নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। সুদীপ আশীষের বিরুদ্ধে রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করে কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজেপির পতাকা তলে শামিল হলেন কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জয়দুল হোসেন, এ আই সি সির সদস্য তথা বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেসের বিজিত প্রার্থী রতন দাস সহ বেশ কয়েকজন নেতা। শুক্রবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে রেলি করে তারা বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে যান। সেখানে তাদেরকে খুঁজে বের প্রদেশ সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করেন।

রাজধানীতে মিছিল করে কংগ্রেসের একজঝাঁক নেতা- কর্মী যোগ দিলেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে রামনগর, বাধারঘাট, চড়িলাম ও বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস দলে বড় ধরণের ভাঙন।

শুক্রবার বিকেলে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কার্যালয়ে হয় যোগদান সভা। সম্প্রতি কংগ্রেস ত্যাগ করা কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জয়দুল হোসেন, এ আই সি সির সদস্য তথা বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেসের বিজিত প্রার্থী রতন দাস সহ বেশ কয়েকজন নেতা কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।শুক্রবার তারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে শামিল হন।

এদিন চার বিধানসভার ১৭৭ পরিবারের ছয় শতাধিক ভোটার গেরুয়া শিবিরে শামিল হন। তাদের বিজেপিতে বরণ করে নেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত, ভগবান দাস, সহ- সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য, সম্পাদক তাপস মজুমদার, যুব নেতা তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ অন্যান্যরা।এদিন যোগদান সভায় প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বলেন, ফের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারা নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে চান। কংগ্রেস-সিপিএম-র জোটেরও কড়া সমালোচনা করেন। তিনি দাবি করেন কংগ্রেসের বিকল্প সিপিএম নয়, বিকল্প হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। মানুষ তা বুঝতে পেরে বিজেপিতে শামিল হচ্ছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উপহার দেওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে পথের সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এদিকে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করার পর কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জয়দুল হোসেন বলেন, কংগ্রেস নেতাদের নোংরামি স্বচক্ষে দেখেছি। তারা অর্থ কামাইয়ে ব্যস্ত। কংগ্রেসের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তিনি বলেন আমরা রাজ্য ও দেশবাসীর স্বার্থে বিকল্প হিসেবে বিজেপির পতাকা তলে শামিল হয়ে কাজ করতে চাই। সারাদেশে এবং রাজ্যে বিজেপির বিকল্প নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অবৈধ স'মিল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ মার্চ।। আবারো বনদস্যুদের ডেরায় হানা দিয়ে অবৈধ সমিল উদ্ধার করতে সক্ষম হয় চড়িলাম রেইঞ্জ অফিসের বনকর্মীরা।শুক্রবার গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে দুপুর একটা নাগাদ চড়িলাম বন দপ্তরের প্রোটেকশন রেঞ্জ অফিসার বিজয় শীলের নেতৃত্বে অন্যান্য বন কর্মীরা বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত চাম্পামুড়া এলাকার একটি রাবার বাগানে অভিযান চালিয়ে এই অবৈধ কাঠের সমিল সহ একটি জেনারেটর উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।যদিও বন দপ্তরের এই অভিযান কালে বনদস্যুরা বন কর্মীদের এই অভিযানের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বনকর্মীদের তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে বনদস্যুরা পরবর্তী সময়ে প্রতিরোধ গড়ার সাহস পায়নি। চড়িলাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসের প্রোটেকশন রেঞ্জ অফিসার বিজয় শীল জানিয়েছেন উদ্ধারকৃত অবৈধ সমিল ও জেনারেটরের কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষাধিক টাকা।তবে স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যায় এই সকল বনদস্যুদের মাথায় রয়েছে প্রভাবশালীদের হাত।যত দিন তাদের আইনের আওতায় আনা না যাবে ততদিন অবৈধ ভাবে বন ধ্বংস বন্ধ হবে না।এখন দেখার আগামী দিনে জেলা ও মহকুমা বন দপ্তর এই সকল বনদস্যুদের আইনের আওতায় আনতে পারে কিনা।

জাতীয় সড়কগুলির কাজ শেষ হলে রাজ্যের অর্থনৈতিক চিত্র আমূল পাল্টে যাবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১ মার্চ।। রাজ্যের জাতীয় সড়কগুলির কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য রাজ্য সরকার সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। জাতীয় সড়কগুলির কাজ শেষ হলে রাজ্যের অর্থনৈতিক চিত্র আমূল পাল্টে যাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাঁর মতে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাতীত দেশের সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। ত্রয়োদশ বিধানসভার চতুর্থ অধিবেশনের প্রথমদিনের দ্বিতীয় পর্বে বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন দ্বারা আনীত বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন দ্বারা আনীত বেসরকারি প্রস্তাবটি হল 'রাজ্যে প্রস্তাবিত জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য এই সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।'

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০১৪ সালের পূর্বে রাজ্যে জাতীয় সড়ক ছিল একটি এবং এর দৈর্ঘ্য ছিল ১৯৮ কিলোমিটার। বর্তমানে জাতীয় সড়কের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬টি এবং দৈর্ঘ্য হল ৯০০ কিলোমিটারের বেশি। তাছাড়াও আরও ৪টি জাতীয় সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নীতিগতভাবে সমর্থন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আইনগত, জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়, ভৌগলিকগত সমস্যাও অনেক সময় রাস্তা নির্মাণের মত কাজকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন সকল ধরণের বাধা কাটিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই জাতীয় সড়কগুলির নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে। তাছাড়া এই বেসরকারি প্রস্তাবকে সমর্থন করে আলোচনা করেন বিরোধী দলনেতা তথা বিধায়ক অনিমেষ দেববর্মা, বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, বিধায়ক গোপাল রায়, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন। পরে সভা কর্তক সর্বসম্মতিক্রমে বেসরকারি প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

সাংবাদিকের মাতৃ বিয়োগে শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ১ মার্চ।। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য কাঞ্চনপুরে কর্মরত স্যন্দন পত্রিকার সাংবাদিক বিকাশ দাসের মাতৃদেবী ঝুনুরানী দাস শুক্রবার দুপুরে শিলচরে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে দশদা গৌরি শংকর পুরস্থিত নিজের ঘরের বারান্দায় পড়ে গিয়ে ওনার পা ভেঙ্গে যায়। দীর্ঘ এক মাসের বেশি সময় ধরে শিলচরে একটি নার্সিং হোমে আইসিও তে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিভিন্ন সাংবাদিক মহল। পাশাপাশি ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করছে এবং পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর মর্মবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আটক নেশাকারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর , ১ মার্চ।। শুক্রবার উদয়পুর ব্রহ্মাবাড়িতে, বিশ্রামগঞ্জ এলাকার এক যুবক ড্রাগস এর টাকা জোগাড় করার জন্য চুরি করতে গিয়ে এক বাড়িতে প্রবেশ করে ধরা পড়ে উত্তমমধ্যম খেলো। চুরির ঘটনা বাড়ির মালিক দেখে ফেলে এবং মালিকের চিৎকারে এলাকার মানুষজন ছুটে এসে অভিযুক্তকে আটক করে। তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে তল্লাশিতে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় বেশ কিছু ড্রাগসের কোটা। জানা যায় অভিযুক্তের বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ এলাকায়। সে অমরপুর যাওয়ার আগে ড্রাগসের টাকা জোগাড় করার জন্যই চুরি করতে নেমেছিল ব্রহ্মাবাড়িতে। কিন্তু সফল হয়নি। পরবর্তী সময়ে পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় রাধাকিশোরপুর থানাতে।

বাইক ও গাড়ির সংঘর্ষে আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১ মার্চ।। বাইক ও গাড়ির সংঘর্ষে আহত হয়েছেন তিনজন। ঘটনা মেলাঘর ইন্দিরা নগর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, টিআর০৭- জি -৫৭৭৪ নম্বরের পালসার বাইক করে মেলাঘর তেল কাজলা গ্রামের হাবিব মিয়া, সাত্তার মিয়া, ফরিদা আক্তার মেলাঘর ইন্দিরা নগরে যাচ্ছিলেন। তখনই পেছন দিক থেকে আসা টিআর০১-এ-০৩৭৮ নম্বরের একটি মারুতি অল্টো গাড়ি বাইকটির পেছন দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে, এতে বাইকে থাকা তিনজন আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মেলাঘরের দমকল বাহিনী ছুটে গিয়ে আহত তিনজনকে উদ্ধার করে মেলাঘর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে তাদের আঘাত বেশি হওয়াতে তাদেরকে জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি চালক পালিয়ে যায়। মেলাঘর থানার পুলিশ এসে বাইক ও গাড়িটিকে উদ্ধার করে মেলাঘর থানা নিয়ে আসে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

রাজ্যে আসছেন মহিলা কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী অলকা লাম্বা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১ মার্চ।। ৫ মার্চ রাজ্যে আসছেন মহিলা কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী অলকা লাম্বা। নারীদের অধিকার সুরক্ষা এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীদের সংগঠিত করার আন্দোলন সংঘটিত করতে আহ্বান জানিয়েছে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ বলেন বিজেপি সরকারের আমলে দেশে নারীরা সুরক্ষিত নয়। দিনের পর দিন দেশে নারী নির্যাতন, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে চলেছে। ভারতে প্রতি ঘণ্টায় তিনজন করে নারী ধর্ষিত হচ্ছেন। এই অভিযোগ করে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী বলেন এটা শুধু নারীদের কাছে নয়, ভারত বাসীর কাছে লজ্জাকর ঘটনা। তিনি সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের কানপুরে দুই কিশোরীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা তুলে ধরে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সংগঠনের কর্মীরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচীতে শামিল হন। মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী শর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী নারীদের সম্ভ্রম রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন চলবে। উল্লেখ্য ৫ মার্চ রাজ্যে আসছেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী অলকা লাম্বা।

তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসো'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ১ মার্চ।। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কার্যকরী কমিটির এক প্রতিনিধি দল শুক্রবার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বিসার ভট্টাচার্যের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন এবং দাবি সনদ তুলে দেন। দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কমিটিতে অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা, মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পে সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রতিকূলতা দূরীকরতে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা, প্রত্যেক সাংবাদিককে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর থেকে পুনরায় প্রেস জ্যাকেট প্রদান করা প্রভৃতি।

এছাড়া পেনশন প্রকল্প সরলীকরণ করে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার আয়ের উর্ধসীমা প্রত্যাহার করা ও পারিবারিক পেনশন কার্যকর করা। পেনশনের জন্য যেসব আবেদনপত্র জমা পড়ে ছে সেগুলো দ্রুত কার্যকর করা। দপ্তর অধিকর্তা দাবি গুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে অ্যাসোসিয়েশনের তরফে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি বিজয় পাল, সহ-সভাপতি প্রতাপ বনিক , সাধারণ সম্পাদক সুনীল দেবনাথ, কোষাধ্যক্ষ সুভাষ ঘোষ ,কার্যকরী সদস্য তন্ময় বনিক ,টিপু সুলতান , মেঘধন দেব ও পশ্চিম জেলা কমিটির সভাপতি তাপস ধর।

রাতের আঁধারে কালী মন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। রাতের আঁধারে কালী মন্দিরে হাত সাফাই করল চোরের দল। চোরের দল ওই মন্দিরে হানা দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী সহ দানবাক্স ভেঙে অর্থ নিয়ে পালিয়েছে।

মন্দিরের জনৈক মহিলা জানিয়েছেন, আজ সকালে কুমারীটিলা কালী মন্দিরে এসে দেখতে পেয়েছেন মন্দিরের দরজা ভাঙা অবসায় আছে। সাথে তিনি পুলিশকে খবর পাঠিয়েছে।গতকাল রাতে চোরের দল হানা দিয়ে মন্দিরের বিভিন্ন সামগ্রী সহ দানবাক্স ভেঙে অর্থ নিয়ে পালিয়েছে। আনুমানিক চার হাজার টাকার জিনিস নিয়ে পালিয়েছে।

আগুনে ভস্মীভূত বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ মার্চ।। বিলোনীয়া থানার অন্তগত ঋষ্যমুখ ব্লকের উত্তর সোনাইছড়ির রিয়াং পাড়ার মনিন্দ্র রিয়াং এর একমাত্র বসত ঘরটি আগুনে সম্পুর্ন ভস্মীভুত, শুক্রবার দুপুরে মনিন্দ্র রিয়াং এর বাড়ী একমাত্র অসুস্থ স্ত্রী ছাড়া আর কেহই ছিলনা, হঠাৎ ঘরের বাইরে কিছু শব্দ শুনতে পেয়ে কোন ক্রমে লাঠি ভড় দিয়ে ঘর থেকে বের হতেই দেখে ঘরের কোনে আগুন জ্বলছে, আগুন দেখে অসুস্থ মহিলা বাড়ীর উঠান থেকে চিৎকার শুরু করে, চিৎকারে এলাকাবাসি সহ মনিন্দ্র রিয়াং ও তার মেয়ে ছুটে আসেন, খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে যায় বিলোনীয়ার দমকল বাহিনী, দমকল বাহিনী সহ এলাকাবাসির তৎপরতায় যতক্ষনে আগুন নিয়ন্ত্রে আসে ততক্ষনে সর্বস্যই পুড়ে ছাই রক্ষা করা যায়নি ঘর সহ কাপড় চোপড় জরুরী কাগজ পত্র আসবাব কিছুই, আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারছেনা মনিন্দ্র রিয়াং ও তার পরিবারের সদস্য সদস্যারা, তবে ধারনা করা হচ্ছে চুলার আগুন থেকেই এত বড় বিপত্তি হতে পারে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এসডিও বদলি রুখতে এলাকাবাসীর অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ মার্চ।। ডিআরডাব্লিউ দপ্তরের এসডিও বদলি নির্দেশের প্রতিবাদ জানিয়ে শুক্রবার সকালে ধর্মনগর নয়াপাড়া স্থিত ডিআরডাব্লিউ দপ্তর ঘেরাও করল স্থানীয় জনগণ। তাঁদের দাবি, বর্তমানে ধর্মনগর দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসডিও সোহেল আহমেদকে বদলি করা চলবে না। প্রসঙ্গত, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এসডিপিও-র দায়িত্বে থাকা সুবোধ ধর প্রয়াত হলে প্রায় একমাস পূর্বে, সোহেল আহমদকে এসডিও-র দায়িত্ব নিয়ে ধর্মনগর ডিআরডাব্লিউ দপ্তরে আসেন। তিনি দায়িত্ব পেয়ে বিগত এক মাসের তাঁর কার্যকালে ধর্মনগরের কালাছড়া ,কাঠালটিলা ,মালাকার পাড়া, অসিত স্মরণী সহ বিস্তীর্ণ এলাকার বহু বছর পুরনো পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করেছেন। তাঁর তড়িৎ গতির কাজে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ধর্মনগর। এরই মধ্যে আচমকা উনার কে বদলি নির্দেশ দেওয়া হয় অন্যত্র। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ধর্মনগরের বিভিন্ন অংশের জনগণের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। সেই ক্ষোভের নিরিখেই আজ সকালে ধর্মনগর পুরো এলাকার বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর সহ শতাধিক জনগণ নয়াপাড়া স্থিত ডিআরডাব্লিই দপ্তরটি ঘেরাও করে রাখে দীর্ঘক্ষণ। দপ্তরের গেটের সামনেই চলে ধর্ণা।

উপস্থিত বিক্ষোদ্ধ জনগণের অভিযোগ রাজধানীর পূর্ত দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি রাজীব পালের চক্রান্তে ধর্মনগরের উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতেই সোহেল আহমেদকে ধর্মনগর থেকে অন্যত্র বদলির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা ধর্মনগর বাসী মেনে নেবে না বলে জানান উপস্থিত জনগণ। দীর্ঘ প্রায় দু'ঘণ্টা যাবৎ চলতে থাকলে ধর্ণা। অবশেষে ঘটনাস্থলে আসেন ধর্মনগর থানার পুলিশ।

বিক্ষুব্ধ জনতা তাদের দাবি, পুলিশের সামনে তুলে ধরলে পুলিশ প্রশাসন বিষয়টি অনুধাবন করত পেরে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন অবিলম্বে দপ্তর সোহেল আহমেদের বদলির নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ না দিল তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।